হারানো ডায়েরির খোঁজে

বিমল কর

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স / ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা-৭০০০৭৩

হারানো ডায়েরির খোঁজে

হারানো ডায়েরির খোঁজে

নোটন এসে বলল, "দাদা, ইশকাপনের টেক্কা এসেছে।"

নাকের ফুটোয় সর্দি-পেনসিল গুঁজে ভিক্টর জোরে-জোরে টানছিল। সবেই বর্ষা নেমেছে কলকাতায়। একটানা তিনমাস গা-জ্বালানো গরমের পর নতুন বর্ষার জল শহর কলকাতাকে একটু নরম করে তুলেছে ঠিকই, কিন্তু ভিক্টর বেচারির কাঁচা সর্দি লেগে গিয়েছে। সকালে একদফা, সন্ধেবেলা একদফা কাক-ভেজা ভিজে গেলে সর্দি লাগবে এ আর নতুন কথা কী!

ভিক্টরের নাক বোজা, গলা চুলকোচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে। আজ সকাল থেকেই সামান্য জ্বর-জ্বর ভাব। তবু সে তার অফিসে এসেছিল। কাজ থাক, না-থাক, অফিসে না এলে ভাল লাগে না। গোটাদুয়েক বড়ি খেয়ে মাথাধরা এখন একটু কম ভিক্টরের। মাঝে-মাঝে ঘামও হচ্ছিল। বিকেল প্রায় শেষ। আর খানিকটা পরে সে উঠে পড়বে। সোজা বাড়ি যাবে।

এমন সময় নোটন এসে বলল, "দাদা, ইশকাপনের টেক্কা এসেছে।"

ভিক্টর নাক থেকে সর্দি-পেনসিল নামিয়ে অবাক হয়ে বলল, "ইশকাপনের টেক্কা! সেটা আবার কে?"

নোটন হেসে বলল, "মুখটা দেখলেই বুঝতে পারবে!"

লিগে আজ মোহনবাগানের খেলা নেই, কাজেই মাঠে যাবার টান নেই নোটনের। ইস্টবেঙ্গলও নিশ্চয় আজ খেলছে না, নয়তো নোটন কানে ট্রানজিস্টর লাগিয়ে বসে থাকত। ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট হারালে নোটনের ফুর্তি বাড়ে। আজ নিশ্চয় এলেবেলে খেলা চলছে মাঠে, আর নোটনও

টেক্কা-গোলাম-সাহেব নিয়ে মত্ত।

ভিক্টর বলল, "কী চায় ?"

"দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে।"

"কে পাঠিয়েছে ?"

"তা কিছু বলল না।"

"দরকার ?"

"তাও বলল না। বলল, দেখা করতে চায়।"

"ডাক, দেখি কে ?"

নোটন চলে গেল।

ভিক্টর হাত-পা এলিয়ে অলসভাবে বসে ছিল এতক্ষণ, এবার খানিকটা সোজা হয়ে বসল। মক্কেল হলেও হতে পারে। ঘরে ঢুকে মক্কেল যদি দ্যাখে গোয়েন্দাসাহেব, ওরফে প্রাইভেট ইন্‌ভেস্‌টিগেটর ভিক্টর ঘোষ বা সিকিউরিটি কনসালট্যান্ট ঘোষসাহেব—বেকার ছোকরার মতন পার্কের বেঞ্চিতে হাওয়া খাওয়ার মুখ করে শুয়ে আছে, সঙ্গে-সঙ্গে ভিক্টরের সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে যাবে মক্কেলের। ভাববে, লোকটা গোয়েন্দা, না, ফুটপাথের জ্যোতিষী! সব জিনিসেরই রীতিনীতি আছে।

নোটন এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ঘরে এল।

ভদ্রলোককে দেখে ভিক্টর বুঝতে পারল, নোটন কেন এই মানুষটিকে ইশকাপনের টেক্কা বলেছে। ওঁর গায়ের রংটি কুচকুচে কালো, একেবারে গোল ধরনের চেহারা, মাথায় টাক, টাকের পাশে সামান্য চুল, গায়ে ছাপছোপ মারা পুশ কোট, পরনের প্যান্টটা কালচে রঙের। গোল মুখ, মোটা-মোটা হাত, গলায় বুঝি একটা সোনার ফিনফিনে হার। হাতে ছাতা।

ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন, "আমার নাম বলাই শাসমল।"

ভিক্টরও হাত তুলে নমস্কার জানাল, "বসুন।"

বলাই শাসমল এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন। নোটন চলে গেল।

চেয়ারে বসে শাসমল পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "আমি আমার মালিকের তরফে আপনার কাছে

এসেছি ।”

ভিক্টর কার্ড দেখছিল। বলল, “আপনাকে কেউ পাঠিয়েছে ? না, নিজেই এসেছেন ?”

“পালসাহেব রেফার করলেন ।”

“ও ! উনি একসময়ে আমার সিনিয়র ছিলেন ।”

“পালসাহেব আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন ।”

ভিক্টর বার-দুই হেঁচে ফেলল জোরে জোরে। রুমাল দিয়ে নাক-মুখ মুছল। বলল, “বৃষ্টিতে ভিজে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে। ...তা বলুন, আমি কী করতে পারি ?”

শাসমল বললেন, “আমি এসেছি আপনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে। আমার মালিক মিস্টার সুনন্দন সিনহা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। বাড়িতে।”

“কার বাড়িতে ?”

“মিস্টার সিনহার কাশীপুরের বাড়িতে ।”

ভিক্টর বলল, “তাঁর বাড়িতে গিয়ে কেন ? আমি ডাক্তার নই যে ‘কল’ দিলে রোগী দেখতে পেশেন্টের বাড়িতে যাব !”

বলাই শাসমল সামান্য থতমত খেয়ে গেলেন। সামলে নিয়ে বললেন, “না, সেজন্যে নয়। মিস্টার সিনহা অসুস্থ। ওঁর একটা চোখে অপারেশান হয়েছে। বিছানায় শুয়ে আছেন। ওঁর পক্ষে এখন বাইরে বেরনো সম্ভব নয় ।”

ভিক্টর যেন অপ্রস্তুত বোধ করল। “ও ! সিক্। কী হয়েছে চোখে ?”

“কাচের গুঁড়ো ঢুকে গিয়েছে ।”

“সে কী ! ...তা এখন ?”

“ভাল আছেন ।”

ভিক্টর টেবিল থেকে সর্দি-পেনসিল তুলে নাকে গুঁজল। টান মারল। “তা হলেও ব্যাপারটা আমার আন্দাজ করা দরকার। আপনার মালিক ঠিক কী জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ?”

শাসমল বললেন, ‘সেটা উনিই বলবেন। আমি শুধু বলতে পারি, আপনাকে একটা ডায়েরি খাতা খুঁজে দিতে হবে ।”

ভিক্টর অবাক। শাসমল কি পাগল ? না, তাঁর মালিক পাগল ? একটা ডায়েরি খাতা খুঁজতে কেউ গোয়েন্দার কাছে আসে ?

ভিক্টর বলল, "ডায়েরি খাতা খুঁজে দেবার জন্যে আমায় নিয়ে যেতে চান ? এরকম কথা তো আমি কখনও শুনিনি মশাই।"

বলাই শাসমলের একটা মুদ্রাদোষ আছে, মাঝে-মাঝেই তাঁর যেন চোয়াল আটকে যায়। সেটা আলগা করে নেবার জন্যে হাঁ করেন। বার-দুই হাঁ করে শাসমল বললেন,"এটা সাধারণ ডায়েরি নয়। ওই একটা ডায়েরির অনেক দাম। টাকাপয়সার হিসেবে তার দাম ধরবেন না। ওটার অন্য মূল্য।"

ভিক্টর একদৃষ্টে শাসমল বা ইশকাপনের টেক্কাকে দেখতে লাগলেন। ভদ্রলোককে দেখতে হয়তো খানিকটা রগুড়ে মনে হয়। কিন্তু পাগলাটে বলে তো মনে হয় না। ওপরচালাক, চতুর, ছটফটে স্বভাবের মানুষও শাসমল নন। শান্ত ধরনের কথাবার্তা।

ভিক্টর কৌতূহল বোধ করল। বলল, "আপনার কার্ড দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনি, মানে আপনারা কী করেন ? কী ধরনের ব্যবসা আপনাদের ?"

বলাই শাসমল বললেন, "আমরা অর্ডার সাপ্লায়ার। সার্কাসে জন্তু-জানোয়ার সাপ্লাই করি।"

ভিক্টর থ মেরে গেল। তারপর বলল, "বলেন কী ! সার্কাসের আবার অর্ডার সাপ্লায়ার থাকে নাকি !"

"আমরা তো রয়েছি", বলে শাসমল একটু হাসলেন। "আমাদের কোম্পানির বয়স তিরিশ বছর হয়ে গেল।"

"সিলভার জুবিলি শেষ !"

"বলতে পারেন। এক সময় ছোটখাটো রাজারাজড়ারা, জমিদারগোছের লোকেরা আমাদের কাছ থেকে বাড়ির চিড়িয়াখানার জন্যে পাখি, ময়ূর, হাতি পর্যন্ত কিনতেন। এখন ওসব নেই। সার্কাসের মালিকরাই যা কেনেটেনে।"

"এই ধরনের ব্যবসা চলে ?"

"চলছে। তবে আগের মতন চলে না।"

"ব্যবসাটা কে শুরু করেছিল ?

"সুনন্দনবাবুর বাবা। ভাল শিকারি ছিলেন। নিজে একটা সার্কাসপার্টিও খুলেছিলেন। 'দি গ্রেট নিউ বেঙ্গল সার্কাস'। সার্কাসটা বেশি দিন চালাতে পারেননি। জন্তু-জানোয়ার সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমি অবশ্য তখন ছিলাম না। পরে এসেছি।"

ভিক্টর নোটনকে ডাকল কলিং বেল বাজিয়ে। ডেকে দু'কাপ চা দিতে বলল।

"আপনারা বাঘটাঘ সাপ্লাই করেন নাকি ?" ভিক্টর হেসে বলল।

"আগে হয়েছে। এখন হয় না।"

"সিংহ ?"

"না। এখন যা হয় তার মধ্যে হাতি-ঘোড়া-বাঁদর ছাড়া আছে পাখি-সাপ-ময়ূর-কুকুর···· ।"

"সার্কাসে ময়ূর দেখিনি তো ?"

"না, ময়ূর আর পাখি এমনি অনেকে কেনে। মাঝেসাঝে সিনেমার লোক আসে ভাড়া নিতে। রেয়ার। সেদিন একটা সিনেমাপার্টির একজোড়া ময়ূর দরকার হয়েছিল। পাঠিয়ে দেওয়া হল। ফেরতও আনলাম। তারপর কী ঝামেলা। টাকা আদায় হয় না। ঝগড়াঝাঁটি থেকে হাতাহাতি। সিনেমাপার্টি মানেই বজ্জাতের দল।"

ভিক্টর হেসে ফেলল।

শাসমল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। লাইটার। "আসুন", বলে প্যাকেট এগিয়ে দিলেন।

"পরে। সর্দিতে গলা খসখস করছে। আপনি খান", বলে ভিক্টর এবার বন্ধু-বন্ধু গলায় বলল, "শাসমলবাবু, এবার আপনি আমায় ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করে বলুন তো ? ডায়েরি হারানোর ব্যাপারটা ঠিক কী ?"

শাসমল একটা সিগারেট ধরালেন। অল্প চুপ করে থেকে বললেন, "আপনাকে আমি সব কথা বলতে পারব না। আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, গার্ডনার বলে এক খ্যাপা সাহেব ছিলেন। লোকে তাঁকে গানাসাহেব বলত। তিনি ছিলেন মিশনারি। বনে-জঙ্গলে পাহাড়তলির ছোট-ছোট গ্রামে কাঠুরে, গরিব মানুষের কুঁড়েতে ঘুরে বেড়াতেন। এই সাহেব একটা

ডায়েরি লিখেছেন। তাতে এক জায়গায় আছে, তিনি বামনের মতন একজোড়া মানুষ দেখেছেন যাদের গায়ের রং একেবারে নীল। মাথার চুল সাদা ধবধবে। তারা মানুষের মতন কথা বলতে পারে না, কিন্তু নানাধরনের শব্দ করতে পারে, ইশারা করতে জানে। এরা গাছের ছাল, জন্তুর চামড়া দিয়ে তৈরি জামা পরে।"

ভিক্টর অবাক হয়ে শাসমলের কথা শুনছিল। নীল মানুষ। সেটা আবার কী ! সাদা, কালো, বাদামি—এমনকি পীত বা হলুদ-ঘেঁসা রঙের মানুষ আছে। সেভাবে ধরলে, সোনালি রংঅলা মানুষও চোখে পড়ে। কিন্তু নীল মানুষ কোথাও আছে বলে ভিক্টর শোনেনি। অবশ্য এই পৃথিবী এত বড়, এত দেশ, এতরকম মানুষ যে, কোথায় কী আছে আর কী নেই বলা মুশকিল।

ভিক্টর ঠাট্টার গলায় বলল, "নীল গাইয়ের কথা শুনেছি শাসমলসাহেব, নীল মানুষের তো কথা শুনিনি।"

শাসমল বললেন, "ব্যাপারটা অদ্ভুত। ভাবলাম, আপনি ডিটেকটিভ মানুষ···"

শাসমলকে থামিয়ে ভিক্টর বলল, "গোয়েন্দা হলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু তার নখদর্পণে থাকবে এমন একটা ধারণা রাইটাররা চালু করে দিয়েছে। গোয়ালে গোরু আছে, আধ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও গোয়েন্দা বলে দিতে পারে, গোয়ালে ক'টা গোরু আছে, কী ধরনের গোরু, এক-একটা গোরু কত দুধ দিতে পারে···। না মশাই, আমি অত বড় গোয়েন্দা নই।" বলে ভিক্টর হেসে উঠল।

শাসমলও হাসলেন। মনে হল, কথাটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। বললেন, "যা বলছিলাম। গানাসাহেবের এই ডায়েরিটা খুবই মূল্যবান আমার মালিকের কাছে। তিনি সেটা উদ্ধার করতে চান।"

নোটন চা নিয়ে এসেছিল। টেবিলে নামিয়ে রাখল। রেখে ভিক্টরের দিকে একটু চোখের ইশারা করল মুচকি হেসে। যেন বলল, ইশকাপনের টেক্কা কিনা বলো ?

চলে গেল নোটন।

বলল, "একজোড়া নীল বামনের কথা ডায়েরিটাতে আছে, এই

জন্যেই কি আপনার মালিক ডায়েরিটাকে মহামূল্য মনে করেন ?”

“একরকম তাই। তবে অন্য অনেক কিছু ওর সঙ্গে থাকতে পারে।”

“আপনি জানেন না ?”

“সামান্যই জানি। যা জানি তা শুনে আপনার লাভ হবে না। আমারও বলা উচিত নয়, কারণ, মালিক আমায় এসব কথা আলোচনা করতে বলেননি। তিনি শুধু আপনার সাহায্য চান, এটাই জানাতে বলেছেন।”

ভিক্টর দু' মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। খুবই বিশ্বস্ত ম্যানেজার শাসমল। বলল, “নিন, চা খান। ...তা সেই সাহেব কোথায় ?”

“তিনি অনেক দিন মারা গেছেন।”

“তাঁর ডায়েরি আপনার মালিকের হাতে এল কেমন করে ?”

“সুনন্দনবাবুর বাবার সঙ্গে গানাসাহেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল। মারা যাবার সময় সাহেব নিজেই সুনন্দনবাবুর বাবাকে দিয়ে যান।” শাসমল চায়ের কাপ উঠিয়ে নিলেন।

ভিক্টর নিজের চায়ের কাপে চুমুক দিল। অন্যমনস্ক হয়ে থাকল সামান্য। পরে বলল, “সুনন্দনবাবুর বাবা ?”

“গত হয়েছেন।”

“কত দিন আগে ?”

“বছর ছ'-সাত।”

“মারা যাবার সময় কত বয়েস হয়েছিল ?”

“বেশি নয়। তেষট্টি-চৌষট্টি। স্ট্রোক হয়েছিল। সেরিব্রাল।” ধীরে-ধীরে চায়ে চুমুক দিলেন শাসমল। “দুর্ধর্ষ মানুষ ছিলেন মহানন্দন। পাথরের মতন চেহারা। লম্বা-চওড়ায় সমান। এক-একটা হাত যেন বাঘের থাবা। খেতে ভালবাসতেন। ডাক্তারদের কথা শুনতেন না। মারাও গেলেন খাবার টেবিলে। ...মানুষটিকে না দেখলে তাঁর সম্পর্কে বোঝা যায় না। কিন্তু তিনি তো আর নেই।”

ভিক্টর বলল, “মহানন্দন-সুনন্দন, এরকম নামও তো বড় শোনা যায় না।”

“নন্দনটা ওঁদের পারিবারিক ব্যাপার। সুনন্দনবাবুর ছোট ভাইয়ের নাম বিশ্বনন্দন।”

"সুনন্দনবাবুর বয়েস কত ?"

"চল্লিশের কম। বছর ছত্রিশ।"

"মহানন্দন যখন মারা যান, সুনন্দনের বয়েস ছিল মোটামুটি তিরিশের মতন। ...আপনি কি বলতে পারেন সেই মিশনারিসাহেব কখন মহানন্দনবাবুকে তাঁর ডায়েরিটা দেন ?"

মাথা নাড়লেন শাসমল, "না। আমি জানি না।"

ভিক্টর একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি নিজের চোখে ডায়েরিটা দেখেছেন ?"

"দেখেছি।"

"কত দিন আগে ডায়েরিটা খোয়া গেছে ?"

"ধরা পড়েছে হপ্তা-দুই আগে। কবে খোয়া গেছে সঠিক করে বলা মুশকিল। তবে মাসখানেকের মধ্যেই।"

ভিক্টর চা খেতে-খেতে একটা সিগারেট তুলে নিল। মনে-মনে যেন হিসেব করছিল। বলল, "সুনন্দনবাবু কাউকে সন্দেহ করেন ?"

"আপনি কথা বলে দেখবেন। ...ডায়েরি চুরির ঘটনা যেদিন সুনন্দনবাবুর চোখে ধরা পড়ল, তার দিন দুই-তিন পরে ওঁর একটা অ্যাকসিডেন্ট হল। কপালে-হাতে চোট লাগল। তবে মারাত্মক যা হল সেটা ওঁর চোখে কাচ ঢুকে যাওয়া। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নেহাত ছোট এক-আধটা টুকরো কাচের কুচি ঢুকেছিল, নয়তো চোখটা নষ্টই হয়ে যেত।"

ভিক্টর যেন অবাকই হল। ডায়েরি চুরির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্টের সম্পর্ক আছে নাকি ? না, নিতান্তই দুটি ঘটনা পরপর ঘটে গিয়েছে।

"অ্যাকসিডেন্ট হল কেমনভাবে ?" ভিক্টর বলল।

"সেটাও অদ্ভুত", বলাই শাসমল বললেন, "গ্যারাজ থেকে জিপগাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছিলেন সুনন্দন। হঠাৎ একটা লোহার তেকোনা রড, মানে অ্যাঙ্গেল, জিপের সামনের কাচের ওপর পড়ে গেল। এত আচমকা ঘটনাটা ঘটে যে, উনি ব্রেক করতে একটু সময় লাগে। কাচটা চুরমার। জিপের মাথার দিকটাও সামান্য তেবড়ে গিয়েছে।"

"লোহার অ্যাঙ্গেল কেমন করে এল ?"

"বলতে পারব না। আপনি যখন যাবেন সবই দেখবেন।"

ভিক্টর ভাবল কিছুক্ষণ। বলল, "ঠিক আছে। যাব।"

"কবে ? আজ ?"

"না। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। কাল যাব। সন্ধের আগেই। ঠিকানা রেখে যান।"

"কার্ডেই আছে।"

ভিক্টর কার্ডটা দেখল, "আপনি কি একই বাড়িতে থাকেন ?"

"না", শাসমল মাথা নাড়লেন। "আমি কাছেই থাকি, গ্যালিফ স্ট্রিটে। আমার ঠিকানাটা আমাদের অফিসের, 'লিট্‌ল্ জু'। ...আপনি যদি বলেন, আমি এসে নিয়ে যেতে পারি।"

"কোনও দরকার নেই। আমি যাব। জায়গাটা একটু বলে দিন।"

শাসমল জায়গাটা বুঝিয়ে দিলেন। রেল ইয়ার্ডের প্রায় গায়ে।

চা শেষ করে শাসমল বললেন, "আপনার সঙ্গে ফিজ্, মানে টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনও কথা হল না... ?"

ভিক্টর বলল, "আগে আমি যাই, সুনন্দনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলি। তারপর দেখা যাবে।"

"তবু ?"

"ছোটখাটো কাজ হলে দেড়-দু' হাজারের বেশি লাগার কথা নয়। আর যদি লেগে থাকতে হয়, আমরা আপনাদের নামে বিল করব। বিল হিসেবে পেমেন্ট।"

শাসমল বললেন, "আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের তরফ থেকে..."

"সে কাল দেখা যাবে।"

"তা হলে আজ আমি উঠি ?"

"হ্যাঁ, আসুন। একটা কথা, আপনি কি বরাবরই এঁদের কাজকর্মের সঙ্গে আছেন ?"

শাসমল উঠে পড়েছিলেন। বললেন, "না। আমি এঁদের সঙ্গে বছর-আষ্টেক রয়েছি। মহানন্দনবাবুর আমলেই এসেছিলাম। ওঁর জীবনের শেষের দিকে।"

"তার আগে ?"

শাসমল কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন, "আমি সার্কাসে খেলা দেখাতাম। ড্যাগার থ্রোয়ার। চোখ বাঁধা অবস্থায় ছোরা ছুঁড়তাম।"

ভিক্টর অবাক হয়ে শাসমলকে দেখতে লাগল।

লিট্‌ল্ জু

পরের দিন বিকেলে এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশ অপরিষ্কার থাকলেও আর জলভরা ঘন মেঘ চোখে পড়ছিল না। বৃষ্টি হওয়ার কথা বলা যায় না, তবে তার আশা কম।

ভিক্টর তার অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। নোটনকে বলল, "তুই অফিস বন্ধ করে চলে যাস।"

নীচে নেমে স্কুটার নেবার সময় ভিক্টর দেখল, কোনও হতচ্ছাড়া ছেলে স্কুটারের সিটের ওপর একপাটি ছেঁড়া কাদা-মাখা হাওয়াই চটি রেখে পালিয়ে গিয়েছে। এখানে হরদম এইরকম হয়। রাজ্যের গাড়ি, স্কুটার-মোটরবাইক পড়ে থাকে নীচে, কে কার খবর রাখে!

সিটটা মুছে নিয়ে ভিক্টর স্কুটারের চাকা দেখে নিল। হাওয়া ঠিক আছে।

এখনও বিকেল ফুরিয়ে যায়নি। ঘড়ির কাঁটায় অবশ্য এখন আর বিকেল নয়। কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকা সত্ত্বেও আলো রয়েছে। আষাঢ় মাসের বিকেল। আলো মরতে দেরি হবে।

ভিক্টর বেরিয়ে পড়ল। ভিড়ভাড়াক্কা ঠেলে টালা পর্যন্ত যেতে কম করেও পঁয়তাল্লিশ, জ্যামে পড়লে ঘণ্টা দেড়েক।

ভিক্টর ঠিক করে নিয়েছিল, টালার ব্রিজ পর্যন্ত গিয়ে বাঁ-হাতি রাস্তা নেবে। কাশীপুর তার চেনা জায়গা নয়। দেখেছে, এইমাত্র।

কাল মাঝে-মাঝেই সে লিট্‌ল্ জু, সুনন্দন, শাসমলবাবুকে নিয়ে ভেবেছে। কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি : মানুষের কত রকম পেশাই না হয়। সত্যি, ভিক্টর কোনওদিন শোনেনি, সার্কাসওলাদের পশুপাখি জুগিয়ে দেবার জন্যে কেউ কোম্পানি খোলে! আজব ব্যাপার! জন্তু জানোয়ার বিক্রি হয় এটা ঠিক, তা বলে ব্যবসা হিসেবে ব্যাপারটা নেওয়া রীতিমত

ঝামেলার কাজ।

কেউ যদি এই ঝামেলার কাজ নেয় নিক, কী-বা করা যাবে! পেশা পেশাই। সুনন্দনের পেশা নিয়ে ভিক্টর মাথা ঘামাতে চায় না। তার অন্য কাজ। একটা পুরনো ডায়েরি খুঁজে বার করা। হতে পারে ডায়েরিটা হারিয়ে গিয়েছে। বা চুরি গিয়েছে। শাসমলের কথাবার্তা থেকে মনে হল, তাদের সন্দেহ চুরি গিয়েছে।

কিন্তু চুরি যাবে কেন? একজোড়া বামন, যাদের গায়ের রং নীল, তাদের ব্যাপারে কৌতূহল থাকতে পারে মানুষের। কৌতূহল থাকলেই কি চুরি করতে হবে? কেন করবে? দরকার কী? তা হলে কি বুঝতে হবে—নীল বামন যত না অদ্ভুত তার চেয়েও বেশি কোনও রহস্য রয়েছে ওদের ঘিরে। বা ওরা কিছু নয় চুরি যাওয়া ডায়েরির মধ্যে অন্য কিছু আছে?

ভিক্টর কোনও কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না আগেভাগে। দেখা যাক সুনন্দন কী বলে?

বাড়ি খুঁজে পেতে তেমন অসুবিধে হল না ভিক্টরের। রেল ইয়ার্ডের গায়ে-গায়েই একরকম। বাঁ দিকে কাশীপুর ব্রিজ। খালের দুর্গন্ধ।

ভিক্টর স্কুটার থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল বাড়িটাকে। অনেক পুরনো। অন্ধকার হয়ে আসায় বাড়িটাকে যেন আরও পুরনো দেখাচ্ছে। ভাঙা ফটক। ফটকের একপাশে একটা ময়লা সাইনবোর্ড 'লিট্‌ল্ জু'।

ফটকের সামনে দরোয়ানের ঘর। দরোয়ান যে কে বোঝা যায় না। জনা তিনেক হিন্দুস্তানি মিলে উনুন ধরাচ্ছে, কয়লার ধোঁয়া উঠেছে, নিজেদের মনেই গল্প করছিল।

ভিক্টরকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। স্কুটার নিয়ে ঢুকে পড়ল সে।

ভেতরে এসে ভিক্টরের মনে হল, এ যেন সেই কোম্পানির আমলের বাড়ি। ভাঙাচোরা, ইটখসা, আগাছায় ভর্তি। একটু নজর করতেই বোঝা গেল, বাড়ির সামনের দিকটা গুদোম হিসেবে ভাড়া দেওয়া। ভাঙা টেম্পো পড়ে আছে গোটা তিনেক, ছোট মাপের এক লরি। গন্ধ উঠছিল বিচিত্র।

আরও খানিকটা এগিয়ে আসতেই ভিক্টর শুনল, কে যেন তাকে

ডাকছে।

বলাই শাসমল।

"এদিকে।" বলাই শাসমল এগিয়ে এসে ডাকলেন, "আসুন"।

ভিক্টর বলল, "আপনি আছেন?"

"আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। এদিকে আসুন। বাড়ির সামনের দিকটা রেশন দোকান, গোডাউন, প্লাস্টিক কারখানা। বাড়ির কেউ এদিকে থাকে না। পেছন দিকে থাকে। আসুন।"

শাসমল পথ দেখিয়ে বাড়ির পেছনের দিকটায় নিয়ে গেলেন। ভিক্টর দেখল, এপাশটা অন্যরকম। পুরনো, ভাঙাচোরা চেহারা হলেও অনেক পরিষ্কার। মানুষজন থাকে বলেই মনে হয়। সামনের বড় বারান্দায় কাঠের জাফরি, আলো জ্বলছে। মাঠের মতন জায়গাটায় কিছু ফুলগাছের ঝোপ। অনেকটা তফাতে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা গোলমতন একটা জায়গা।

ভিক্টর বলল, "ওটা কী?"

"ওটা! ওটা আমাদের জন্তু-জানোয়ার রাখার জায়গা। রাত্তিরে ভাল বুঝতে পারবেন না। দিনের বেলায় দেখবেন। দেখার মতন এখন কিছু পাবেন না। গোটা চারেক হরিণ, আধ ডজন বাঁদর, কিছু পাখি, দু' জোড়া ময়ূর, আর একটা ভাল্লুক আছে। ভাল্লুকটা বুড়ো। মরার সময় হয়েছে। হাতি আর নেই। বছর-দুই আগে একটা উট জোটানো গিয়েছিল। বিক্রি হয়ে গিয়েছে।"

ভিক্টর স্কুটার রাখল একপাশে।

বাড়িটা দোতলা। পুরনো আমলের বলে ছাদ এত উঁচু যে, মনে হয়, তিনতলার সমান বাড়ি।

শাসমল ভিক্টরকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে কাঠের জাফরি-ঘেরা বারান্দা টপকাল।

বারান্দার মধ্যেই বসার জায়গা। বাতি জ্বলছিল। বেতের সোফাসেটি, পায়ের তলায় বিয়ে বাড়ির শতরঞ্চির মতন এক বড় শতরঞ্চি। পাতাবাহারের গোটা-দুয়েক টব। দেওয়ালে এক জোড়া হরিণের শিং ঝুলছে।

শাসমল বললেন, "বসুন। আমি সুনন্দনকে ডেকে আনি।"

ভিক্টর লক্ষ করল, তার অফিসে বসে মালিককে আপনি-আজ্ঞে করলেও বাড়িতে সেই সৌজন্য দেখাবার দরকার পড়ে না শাসমলের।

ভিক্টর এপাশ-ওপাশ লক্ষ করছিল। নীচে যেখানে সে বসে আছে, তার ডান পাশে একটা দেওয়াল। পুরো নয়, আধাআধি। মাথার দিকের গড়নটা তোরণের মতন। ওপাশে ঘরদোর। এখান থেকে দেখা যায় না। বাঁ দিকে কাঠের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। সিঁড়ির মুখে একটা ঘর। খড়খড়ি-দেওয়া দরজা। দরজা বন্ধ ছিল।

ভিক্টর একটা সিগারেট ধরাল। আজ তার সর্দির ভাব অনেকটা কমে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে নাক ভারী হয়ে উঠছে ঠিকই তবে মাথায়-কপালে যন্ত্রণা কম।

সামান্য পরেই পায়ের শব্দ শুনল ভিক্টর। সিঁড়ির দিকে তাকাল। সুনন্দন নেমে আসছে রেলিং ধরে। তার পাশে বলাই শাসমল।

সুনন্দন নীচে নেমে এল। পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির একটা কি দুটো বোতাম লাগানো, বাকিগুলো খোলা।

সুনন্দন কাছে আসতেই ভিক্টর তাকে নজর করে দেখল। দেখতে সুশ্রী। মাঝারি স্বাস্থ্য। মাথার চুল কোঁকড়ানো। চোখে গগলস্ ধরনের চশমা। একটা চোখের ওপর পাতলা প্যাড লাগানো আছে এখনও। লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে প্যাড আটকানো।

বলাই শাসমল কিছু বলার আগেই সুনন্দন হাত তুলে নমস্কার করল।

ভিক্টরও নমস্কার জানাল।

শাসমল বললেন, "সুনন্দন, তুমি বোসো, আমি একটু চায়ের কথা বলে আসি।"

সুনন্দন বসল। বলল, "চা না কফি?"

ভিক্টর বলল, "যা হোক, আমার আপত্তি নেই।"

শাসমল আবার সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সুনন্দন বলল, "আমরা মিস্টার টি· কে· পালের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি অসুস্থ। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বললেন।"

ভিক্টর বলল, "মিস্টার পাল আমার সিনিয়ার ছিলেন। উনি অসুস্থ? কী

হয়েছে ?”

“বললেন, হার্টের একটু গোলমাল। সিরিয়াস নয়। বিশ্রাম নিচ্ছেন।”

ভিক্টর কিছু বলল না। একদিন পালসাহেবের খবর নিয়ে আসতে হবে। তবে ভিক্টরের মনে হল, ‘স্টার সিকিউরিটি সার্ভিস’ থেকে বেরিয়ে এসে পালসাহেব নতুন যে ফার্ম খুলেছিলেন, সেটা পাঁচহাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উনি বেজায় ধাক্কা পেয়েছেন। অনর্থক অনেক টাকাও নষ্ট হয়েছে ওঁর।

সুনন্দন বলল, “আপনার সঙ্গে বলাইদার কথাবাতা হয়েছে, শুনেছেন তো সব ?”

ভিক্টর তাকাল। মাথা নাড়ল। বলল, “না। আমি বারোআনা কথাই শুনিনি। শুধু শুনলাম, আপনার কাছে এক সাহেবের একটা ডায়েরি খাতা ছিল। সেটা মহামূল্যবান। ডায়েরিটা খোয়া গিয়েছে। খুঁজে দিতে হবে।”

সুনন্দন বলল, “হ্যাঁ। ডায়েরিটা নানাদিক দিয়েই মূল্যবান।”

ভিক্টর বলল, “ডায়েরির কথা বলুন। শুনলাম, গার্ডনার বলে এক সাহেবের লেখা… ।”

“হ্যাঁ ! গার্ডনার ছিলেন এক মিশনারি পাদরি। তিনি ক্যাথলিক ছিলেন। এক সময় রাঁচির দিকে মিশনারি স্কুলে পড়াতেন। পরে মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে কাজকর্ম করে বেড়াতেন। মানুষটি বড় ভাল ছিলেন। খ্যাপা-গোছেরও ছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। আমার বাবার সঙ্গে পাদরিসাহেবের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। কখনও কখনও তিনি বাবার কাছে এসে থাকতেন দশ-পনেরো দিন।”

“এখানে ? কলকাতায় ?”

“না। আমাদের একটা ছোট বাড়ি ছিল। কাঠের বাংলো বাড়ি। ঢালপাহাড়ি বলে একটা জায়গায়।”

“জায়গাটা কোথায় ?”

“পঞ্চকোট পাহাড়ের কাছে। আপনি আদ্রা দিয়ে যেতে পারেন। আবার আসানসোল দিয়েও যেতে পারেন।”

“বাড়িটা কি শখের জন্যে করা হয়েছিল ?”

"অনেকটা তাই। তবে বাবা জঙ্গল পশুপাখি ভালবাসতেন। আমাদের ব্যবসাও ছিল জন্তু-জানোয়ার বিক্রির। বাড়িটা বাবার কাজেও আসত।"

"সেই বাড়ি এখনও আছে ?"

"না। বিক্রি হয়ে গেছে।"

"ডায়েরিতে সাহেবের নিজের কথা ছিল, না, আরও কিছু ছিল ?"

সুনন্দন চশমায় হাত দিল। তার রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে চোখ দেখা যাচ্ছে না। প্যাড পরানো চোখটার, কপাল আর গালের দিকে লিউকোপ্লাস্ট লাগানো। সুনন্দন বলল, "নিজের কথা বলতে যা দেখতেন-টেখতেন তার কথা, গাছপালার কথা, প্রকৃতির কথা, মানুষের কথা। মাঝে-মাঝে বাইবেলের কোনও কথার ব্যাখ্যা, নিজে যা মনে করেছেন।"

ভিক্টর বলল, "তা হলে এই ডায়েরি এত মূল্যবান কেন ?"

সুনন্দন বলল, "ওই ডায়েরির মধ্যে দু-চারটে কথা আছে..."

"যেমন, নীল রঙের মানুষের কথা ?"

সুনন্দন ঘাড় নাড়ল। বলল, "দু'জনের কথা। ওদের গায়ের রং নীল। মাথায় বামন। মানুষের ভাষায় কথা বলতে জানে না। স্বভাব খানিকটা বনমানুষের মতন।"

ভিক্টর আরাম করে বসল। পা ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে। সুনন্দনকে লক্ষ করছিল। বলল, "এই দু'জন নীল বামনের জন্যেই কি ডায়েরিটা অত মূল্যবান ?"

সুনন্দন কিছু বলতে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল পায়ের। শাসমল আসছেন। সঙ্গে বাড়ির বুড়ো মতন এক কাজের লোক। হাতে ট্রে।

শাসমলরা নীচে এলেন।

সামনের গোলমতন বেতের সেন্টার টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল বুড়ো লোকটি। রেখে চলে গেল।

ভিক্টর দেখল, তিন পেয়ালা কফি। একটা গোল ডিশে বড়-বড় কিছু সিঙাড়া।

শাসমল বললেন, "নিন। ঘরে ভাজা সিঙাড়া। বর্ষার দিন, ভালই

লাগবে।" বলে ডিশটা টেবিল থেকে তুলে ভিক্টরের দিকে এগিয়ে দিলেন।

ভিক্টর হেসে বলল, "পরে নিচ্ছি। বেশি গরমে জিভ পুড়ে যাবে।"

শাসমলের দিকে তাকাল সুনন্দন। বলল, "আপনি বসুন, বলাইদা।"

বলাই শাসমল বসলেন।

ভিক্টর সুনন্দনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি যেন কী বলছিলেন? নীল বামনের কথা?"

সুনন্দন বলল, "এই অদ্ভুত দুই জীব, মানুষই বলুন বা বনমানুষ বলুন, এখনও বেঁচে আছে কি না আমি জানি না। কিছুদিন আগে, মাস-দুই আগে আমি একটা চিঠি পাই। 'প্যান্থার সার্কাস' নামে এক সার্কাস আমাদের চিঠি লিখে জানায়, তারা শুনেছে যে, আমাদের কাছে ব্লু ডোয়ার্ফ' নামের এক জন্তু আছে, মানুষের মতন দেখতে। ওরা ওদের সার্কাসের জন্যে ব্লু ডোয়ার্ফ কিনতে চায়। ভাল দাম দেবে।"

ভিক্টর বলল, "প্যান্থার সার্কাস! নাম শুনিনি।" বলে হাত বাড়িয়ে একটা সিঙাড়া নিল ডিশ থেকে।

সুনন্দন বলল, "বাইরের সার্কাস। সিঙ্গাপুরে ওদের অফিস।"

"বাইরের সার্কাস! দেশের বাইরেও আপনারা জীব-জন্তু চালান দেন?"

"আগে দেওয়া হত। বাবার জানাশোনা ছিল অনেক। আমাদের কোম্পানির নামও লোকে জানত। আমি দিই না। দেবার ক্ষমতাও নেই। বাবাও শেষের দিকে বাইরেব সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।"

শাসমল বললেন, "গভর্নমেন্ট আজকাল বড় কড়া। হরেকরকম ফ্যাকড়া বার করেছে। আমাদের পোষায় না।"

সুনন্দন কফির পেয়ালা তুলে নিল। "আছেই-বা কী আমাদের! কোনওরকমে চালিয়ে যাচ্ছি।"

ভিক্টর বলল, "প্যান্থার সার্কাস আপনাদের কেন চিঠি লিখল? জানলই-বা কেমন করে যে, আপনারা ব্লু ডোয়ার্ফ-এর খোঁজ রাখেন?"

"কী জানি!" সুনন্দন বলল, "সেটাই রহস্য।"

"প্যান্থার সার্কাসের চিঠির জবাব দেননি আপনি?"

"দিয়েছি। জবাবটা স্পষ্ট নয়।"

"কেন ?"

"ভাবলাম, একবার খোঁজখবর করে দেখা যাক। যদি সত্যি নীল বামন ধরা যায়, চালান দিই আর না দিই, দেশের মধ্যেও হুলুস্থূল পড়ে যাবে। আমাদের নাম ছড়াবে। টাকাপয়সার দিক থেকেও সুবিধে হতে পারে। ...আর যদি বাইরে চালান দেওয়া সম্ভব হয়, মোটা টাকা পেতে পারি।"

শাসমল বললেন, "টাকার ব্যাপারটা পরে ভিক্টরসাহেব, প্রথম যা আমাদের মাথায় আসে তা হল, এইরকম অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে কেউ জানে না। যদি ওদের ধরা যায়, বিরাট ব্যাপার হবে। পণ্ডিতরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কত রকম রিসার্চ হবে! এক-একজন এক-একরকম বলবে।" শাসমল যেন হালকাভাবেই বললেন শেষের কথাগুলো।

ভিক্টর মাথা নাড়ল। বলল, "তা ঠিক। ...আচ্ছা, নীল বামনের বা মানুষের কথা আপনারা আগে কোথাও শুনেছেন বা পড়েছেন ?"

সুনন্দন বলল, "বলাইদা পড়েছেন।"

ভিক্টর শাসমলের দিকে তাকাল।

শাসমল সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমার একটু আজেবাজে বই পড়ার অভ্যেস আছে, স্যার। মানে, আনন্যাচারাল ব্যাপার-ট্যাপার সম্পর্কে ...কী বলব, ওই একটা কৌতূহল। আমি একটা বইয়ে 'ব্লু বয়' সম্পর্কে পড়েছি। এটা গ্রেট ব্রিটেনে। আর একজনের কথা পড়েছি, গ্রিস দেশে তাকে দেখা গিয়েছিল, তার নাম হয়েছিল 'ব্লু রিবন্'। সে ছিল মেয়ে। ...আমাদের দেশে নীল রঙের মানুষ দেখা না গেলেও এককালে হিমালয়ের দিকে দু-একজন নীলচে রঙের মানুষ দেখা গিয়েছে।"

ভিক্টর কফির পেয়ালা টেনে নিল। বলল, "এরা নীলবর্ণ হল কেন ?"

"একদল বলে, প্রকৃতির খেয়াল। আর একদল বলে, অন্য জগতের জীব।"

ভিক্টর হাসল। সুনন্দনের দিকে তাকাল। "আপনারা কি প্যাম্থার সার্কাসের চিঠি পেয়ে নীল বামনদের খোঁজ করতে শুরু করেন ?"

মাথা নাড়ল সুনন্দন। বলল, "আমি আর বলাইদা সাহেবের ডায়েরি

থেকে জায়গাটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। তারপর খোঁজখবর করে মোটামুটি যখন ঠিক করেছি, দু'জনে একবার সরেজমিনে দেখতে যাব, তখনই ডায়েরিটা চুরি হয়ে গেল।"

ভিক্টর কফি খেতে-খেতে বলল, "কোথায় থাকত ডায়েরিটা?"

"আমার ঘরে। আলমারিতে।"

"আলমারি খোলা থাকত, না, চাবি দেওয়া থাকত।"

"চাবি দেওয়া থাকত।"

"ডায়েরির কথা কে-কে জানত?"

"তা সকলেই। ...আসলে, গার্ডনারসাহেবের ডায়েরি বলেই ওটা পড়ে ছিল। ও নিয়ে আলাদা করে কেউ মাথা ঘামাতে যায়নি। আমি কখনও কখনও নেহাতই সময় কাটাতে পাতা উলটেছি। বর্ণনাগুলো পড়েছি। বেশ লাগত। গাছপালা ফুল পাখি জন্তু-জানোয়ারের কথা পড়তেও ভাল লাগত। মাঝে-মাঝে থাকত আদিবাসীদের কথা, তাদের আচার-আচরণের কথা। ধর্ম সম্পর্কেও সাহেব তাঁর মনের ভাবনা লিখে রাখতেন। ...একজন সরল, সুন্দর মানুষের নানা ব্যাপারে দেখাশোনা, অভিজ্ঞতার কথা পড়তে ভাল লাগত এই মাত্র। অন্য কোনও মূল্য তার বুঝিনি।"

"ব্লু ডোয়ার্ফের কথায় বুঝলেন?"

"হ্যাঁ। জিনিসটা আমি পড়েছিলাম আগেই। একবার নয়, অনেকবার। ঠিক বিশ্বাস হয়নি। তেমন কৌতূহলও হত না। ভাবতাম, খ্যাপা সাহেবের চোখে দেখতে ভুল হয়েছে। প্যান্থার সার্কাসের চিঠি পেয়েই আমার চমক লাগল।"

ভিক্টর হেসে বলল, "তখন থেকেই ডায়েরিটা মহামূল্য হয়ে গেল?"

"তা বলতে পারেন।"

ভিক্টর কফি খেতে-খেতে কিছু ভাবছিল। পরে বলল, "কতদিন আগে ডায়েরিটা চুরি গিয়েছে?"

"মাসখানেকের মধ্যেই। আমার ধারণা, দু-তিন হপ্তার মধ্যে।"

"আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?"

সুনন্দন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে বলল, "কাকে করব! বাইরের লোক বলতে আমার এক মামাতো ভাই আছে, আর মহাদেব বলে এক

বন্ধু। এরা দু'জন ছাড়া প্যান্থার সার্কাসের চিঠির কথা অন্য কেউ জানত না। তাও ওরা ভাসাভাসা জানত। আমি আর বলাইদাই পুরো ব্যাপারটা জানতাম।"

ভিক্টর বলল, "ডায়েরি চুরি যাবার পরই আপনার অ্যাকসিডেন্ট হয়?"

"হ্যাঁ।"

"ডায়েরি চুরি আর অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে?" ভিক্টর বলল। বলে একদৃষ্টে সুনন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুনন্দন বলল, "আমারও কেমন সন্দেহ হয়।"

"বিশেষ কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?"

মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে সুনন্দন বলল, "এত আচমকা ব্যাপারটা ঘটেছিল যে, আমি কিছু বুঝতেই পারিনি। চোখ তখন বন্ধ করে ফেলেছি।"

শাসমল বললেন, "আমি সন্দেহ করি।"

"কাকে?"

"অ্যাকসিডেন্টটা ঘটানো হয়েছে বলে সন্দেহ করি। কে যে হুক করে কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল তা এখন বলতে পারব না। কেউ না কেউ করেছে।"

সুনন্দন বলল, "আমি মারা যেতে পারতাম। কিংবা আরও ভয়ঙ্করভাবে আহত হতে পারতাম।"

ভিক্টর বলল, "আজ আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। অন্য একটা কাজ আছে বাড়িতে।" বলে কফির পেয়ালা রেখে দিল। "কাল বা পরশু আপনাদের কখন সময় হবে বলুন। আমি বেলাবেলি আসতে চাই। আপনাদের লিটল জু আমাকে দেখতে হবে। গ্যারাজটাও। যদি পারেন, আপনাদের বাড়ির ঘরদোরও আমায় দেখিয়ে দেবেন।"

শাসমল বললেন, "আপনি কালই আসুন। আমি থাকব।"

ভিক্টর বলল, "আসব। ...ডায়েরির ব্যাপারে আমার আরও কিছু জানা দরকার। আমার মনে হয় সুনন্দনবাবু, একটা কাগজে পয়েন্টগুলো নোট করে রাখলে ভাল হয়।"

"কিসের পয়েন্ট ?"

"যেগুলো আপনার কাছে জানানো দরকার বলে মনে হবে। আপনি সময় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন। ভেবে দেখুন, কোনগুলো জানানো দরকার। কাল আমি আপনার কথা শুনব। আজ উঠি।"

ভিক্টর উঠে দাঁড়াল।

মোহিনীমোহন ও পাতা-ছেঁড়া ডায়েরি

গা এলিয়ে বসে ভিক্টর 'ট্রু ডিটেকটিভ'-এর পাতা ওলটাচ্ছিল। পত্রিকাটা তার যে খুব পছন্দ তা নয়, তবু অনেক সময় মালমসলা খুঁজে পাওয়া যায়।

দুপুর প্রায় শেষ। আলস্য লাগছিল ভিক্টরের, হাই উঠছিল। মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে ছাদের দিকে তাকাচ্ছিল, মাথায় ঘুরছিল 'লিটল জু'-এর কথা।

এমন সময় কল্যাণ চাটুজ্যে এসে হাজির। ভিক্টরের বন্ধু। খবরের কাগজে কাজ করে। ফোটোগ্রাফার।

কল্যাণের কাঁধে সব সময় একটা ব্যাগ ঝোলে। তার মধ্যে তার ক্যামেরা আর টুকিটাকি। ব্যাগ নামিয়ে রাখতে রাখতে কল্যাণ বলল, "কী রে ভিকু, আজকাল খুব লায়েক হয়ে গিয়েছিস। ডাকলেও সাড়া দিস না।"

ভিক্টর বলল, "ডাকলি কখন ?"

"কাল সন্ধের মুখে যাচ্ছিলি কোথায় ? গ্যালিফ স্ট্রিটের মুখে তোকে দেখলাম। স্কুটার হাঁকিয়ে যাচ্ছিস।"

পত্রিকাটি রেখে দিল ভিক্টর। হেসে বলল, "একটা কাজে যাচ্ছিলাম।"

"কাজ ! তোর আবার কাজ ! ·· জুটেছে কিছু ?"

"জুটব জুটব করছে। তোর খবর কী বল ? কাল তুই আমায় দেখলি কেমন করে ?"

"একটা ছবি নিতে গিয়েছিলাম। লরি ভার্সেস স্টেটবাসের গুঁতোগুঁতি। দুটোই ষাঁড়ের মতন মুখোমুখি লড়ে গিয়েছে। ফেরার পথে তোকে দেখলাম।"

"তাই বল। ... তা এখন কোথায় ?"

"এদিকেই একটা কাজে যাচ্ছি। দেরি আছে। ভাবলাম তোর সঙ্গে বসে আড্ডা মেরে যাই। চা বল।"

"বলতে হবে না। নোটন তোকে দেখেছে। চা চলে আসবে।"

কল্যাণ নস্যিখোর। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে আঙুলের ডগায় নস্যি তুলতে তুলতে বলল, "বাড়ির খবর কী ? দিদি কেমন আছে ?"

"বাড়ির খবর বাড়িতে গিয়ে নিবি।"

"যাব। দিদিকে বলবি বর্ষা পড়েছে। এবার একদিন গিয়ে খিচুড়ি খেয়ে আসব। উইথ্ ইলিশমাছ ভাজা।"

"মাছটা তুই নিয়ে যাবি।" ভিক্টর হেসে বলল, "বাগবাজারের ইলিশ।"

কল্যাণ নস্যির টিপ নাকের কাছে এনে গম্ভীরভাবে বলল, "সরষের তেলটাও নিয়ে যাব নাকি ?"

ভিক্টর জোরে হেসে উঠল। কল্যাণও।

হাসি থামলে ভিক্টরের হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। বলল, "হ্যাঁ রে কলু, তুই না বাগবাজারে থাকিস ?"

"বাগবাজার নয়, শ্যামবাজার। রাস্তার এপারে। কেন ?"

ভিক্টর একটু ভাবল, "লিটল জু-এর নাম শুনেছিস ?"

"লিটল জু !" কল্যাণ অবাক। এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন এ-ধরনের কোনও নাম ভূ-ভারতে আছে বলে সে জানে না।

"শুনিসনি ?"

"না। কোথায় সেটা ?"

ভিক্টর জায়গাটার বিবরণ দিল। বলল, "কাশীপুর ব্রিজ ...."

"ওটা চিৎপুর ব্রিজ। কেউ কেউ কাশীপুর বলে। তা চুলোয় যাক্। না ভাই, আমি লিটল জু-এর নাম শুনিনি। কী আছে সেখানে ?"

ভিক্টর বুঝিয়ে দিল লিটল জু-এর ব্যাপারটা। বলল, "ওর মালিকের একটা কেস হাতে নিচ্ছি।"

"কী কেস ?"

"ডায়েরি চুরি।"

কল্যাণ বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "ডায়েরি চুরি কী রে? ডায়েরি চুরির আবার কেস হয় নাকি? এ কী গোয়েবলস গোয়েরিং-এর ডায়েরি?"

ভিক্টর মাথা নাড়ল। বলল, "না। কিন্তু অদ্ভুত লোকের।"

নোটন চা নিয়ে এল দু' কাপ।

কল্যাণ বলল, "খালি পেটে শুধু চা খাওয়াবি? তোর সেই দাঁতভাঙা খোট্টা বিস্কিট নেই?"

মাথা নাড়ল নোটন। বলল, "শশা আছে? খাবে?"

"ধুত, শশার সঙ্গে চা খায়! তুই কোথাকার লোক! স্যাট্ করে দুটো লেড়ো বিস্কুট নিয়ে আয়। যাবি আর আসবি। আমার গ্যাস্ট্রিক হয়েছে। ডাক্তার বলেছে দু' ঘণ্টা অন্তর পেটে কিছু দিতে।"

নোটন হাসতে হাসতে চলে গেল।

ভিক্টর বলল, "তোর শুধু খাওয়া! খেয়ে-খেয়েই মরবি।"

"যে খাটে, সে খায়। তোর মতন টেবিলে পা তুলে বসে আমাদের দিন কাটে না, ভাই। সারাদিন চরকি মারতে হয়। নো রোদ. নো ঝড়বৃষ্টি, নো শীত। ... যাক্ গে, তোর কেসটা বল, শুনি। কার ডায়েরি? কিসের ডায়েরি? লিটল জু-ই বা কেন?"

চা খেতে-খেতে ভিক্টর ছোট করে সুনন্দনদের কথা, ডায়েরি হারানোর বৃত্তান্ত বলল। এমনকি সুনন্দনের অ্যাকসিডেন্টের কথাও।

কল্যাণ সবই শুনল। এরই মধ্যে নোটন দুটো গজামার্কা বিস্কিট এনে দিল কল্যাণকে।

চা বিস্কিট খেতে-খেতে কল্যাণ বলল, "আজব ব্যাপার! ... নীল রঙের মানুষ হয় বলে আমি জানি না। তবে কোনও কারণে যদি গায়ের রং পালটে গিয়ে থাকে ... কে জানে!"

ভিক্টর বলল, "প্রকৃতির খেয়াল হলেও হতে পারে। আবার অন্য কিছুও থাকতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বাইরে থেকে একটা সার্কাসপার্টির চিঠি আসার পরেই ডায়েরি কেন চুরি যাবে? আর ডায়েরি চুরির পর সুনন্দনের ওরকম অ্যাকসিডেন্টই বা হবে কেন? ও তো আরও বিশ্রীভাবে চোট পেতে পারত? মাথায় তেমনভাবে লাগলে মরেই

যেত।”

কল্যাণ মাথা হেলাল। বলল, “সুনন্দনকে কেউ মারার চেষ্টা করেছিল ?”

“সন্দেহ হয়।”

“কেন ?”

“নিজেদের স্বার্থে।”

“ ...তা তুই আমায় কিছু করতে বলিস ?”

ভিক্টর বলল, “আমার মনে হয়, তুই একটু খোঁজ করলে লিটল-জু সম্পর্কে খবরাখবর আনতে পারবি। তোর তো ওদিকে অনেক বন্ধু।”

কল্যাণ বলল, “ঠিক আছে। পাত্তা লাগাচ্ছি।”

“আর একটা কাজ করবি ? আমাকে একটা ছবি তুলে দিবি লিট্‌ল-জু-এর ?”

কল্যাণ বলল, “ছবি তোলা কোনও প্রবলেম নয়। কিন্তু তুলব কেমন করে ? লোকের বাড়ি বয়ে গিয়ে হুট করে ছবি তোলা যায় না। পারমিশান নিতে হয়।”

ভিক্টর বলল, “চেষ্টা করে দ্যাখ। না হলে আমি আছি।”

মাথা নাড়ল কল্যাণ।

আরও খানিকটা গল্পগুজব করে চা খেয়ে উঠে পড়ল কল্যাণ। বলল, “চলি। আমি পাত্তা লাগাচ্ছি। তোকে জানাব।”

কল্যাণ চলে যাবার পর ভিক্টর একটা সিগারেট ধরিয়ে গা এলিয়ে বসে ভাবতে লাগল। ডায়েরি চুরির সঙ্গে বাইরের সার্কাস কোম্পানির চিঠির একটা সম্পর্ক রয়েছে যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কথা হল, বাইরের সার্কাস কোম্পানি নীল বামনের কথা জানল কেমন করে ? কে তাদের জানাল ? রাম-শ্যাম যে মানুষটিই জানিয়ে থাকুক তার সঙ্গে সার্কাস কোম্পানির কিসের সম্পর্ক ? ভেতরে ভেতরে কি কোনও লেনদেন চলছিল ? যদি চলে থাকে, টাকার পরিমাণ কত ? আর যদি ধরেই নেওয়া যায়— ভেতরে ভেতরে লেনদেন চলছিল তা হলে সুনন্দনকে চিঠি লেখার কারণ কী ? তার অজান্তেই তো সব হতে পারত ! তার ওপর সুনন্দনের অ্যাকসিডেন্ট। কেন ?

ব্যাপারটা জটিল। গোলমেলে।

ভিক্টরের আরও গোলমাল লাগছে নীল বামনের কথা ভেবে। সত্যিই কি নীল বামন ছিল, এখনও রয়েছে? না, ওটা কোনও ধাঁধা? এমন কোনও গোপন সঙ্কেত যা সাধারণের ধরার উপায় নেই? তবে, তা যদি হবে— গানাসাহেবের মতন মানুষ, যাঁর অত দেখাশোনা পরিচয় রয়েছে বন-জঙ্গলের সঙ্গে, সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে, তিনি কেন তা ধরতে পারলেন না?

ভিক্টর মাথার চুল ঘাঁটিতে লাগল। কিছুই ধরা যাচ্ছে না।

এখন সাড়ে তিন কি পৌনে চার। ভিক্টর আজ আগে আগেই বেরিয়ে পড়বে। সুনন্দনদের বাড়িতে যাবে। লিট্‌ল-জু দেখবে। সেই সঙ্গে গ্যারাজটাও।

বসে থাকতে থাকতে আচমকা কী মনে পড়ে গেল ভিক্টরের। টেবিলের নীচের ড্রয়ারে টেলিফোন গাইড রাখে সে। গাইড তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একটা নম্বর খুঁজে কাগজে লিখে নিল।

বিশ্বাসদাকে এখন পাওয়া যাবে কি না কে জানে!

টেলিফোনেরও যা অবস্থা আজকাল ভিক্টর বারকয়েক চেষ্টা করল, পারল না। লাইনই লাগছে না। বিরক্ত হয়ে উঠছিল ভিক্টর।

হঠাৎ তার ফোনই বেজে উঠল। রিসিভার তুলল ভিক্টর, "হ্যালো?"

"ঘোষসাহেব?" ও-পাশের গলা।

"শাসমলসাহেব নাকি?"

শাসমল কী বলতে লাগলেন।

ভিক্টর মন দিয়ে শুনছিল। শেষে বলল, "আমি আসছি। ... না না, ছ'টার আগেই পৌঁছব। ভদ্রলোককে বসিয়ে রাখুন। ... কী? অতক্ষণ বসবেন বলে মনে হয় না? আরে মশাই, চেষ্টা করে দেখুন না। একান্তই যদি বসতে না চান ঠিকানাপত্র নিয়ে রাখুন। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব।"

ফোন রেখে দিল ভিক্টর।

ফোন রেখেই আবার তুলল। নম্বরটা তার দরকার।

এবার বিশ্বাসকে পাওয়া গেল।

ভিক্টর বলল, "বিশ্বাসদা, আমি ভিক্টর। ...না না, বেঁচেবর্তেই আছি। ... গালাগাল দেবে দাও, কী করব বলো, ভাবি, তোমার বাড়িতে চলে যাব, হয়ে ওঠে না। বাড়িও করেছ বাবা, বঁড়শে বেহালা ছাড়িয়ে।" ভিক্টর ওপার থেকে কোনও কথা শুনে হাসতে লাগল। তারপর বলল, "শোনো, একটা দরকারে ফোন করছি। তোমার কাজকর্ম এখন কেমন ? ডাল্ পিরিয়ড। তা আমাকে একটা লোক দাও। নজর রাখতে হবে। কী ? না না, নর্থ ক্যালকাটায় আসতে হবে। টালার দিকে। কাশীপুর ...। ব্রিজটার কাছেই। একটা কেস হাতে নিয়েছি। হপ্তাখানেক চোখ রাখলেই হবে। ...কী বলছ ? না, চব্বিশ ঘণ্টা দরকার নেই। সকাল থেকে সন্ধে। ... তুমি কালকেই আমার অফিসে পাঠিয়ে দিও। টাকা পয়সার ব্যাপারটা তুমিই ঠিক করো। ... একদিন চলে এসো। সেই কবে মাস ছয়েক আগে এসেছিলে ? তা হলে ছাড়ছি। কালই লোক পাঠাবে। ও. কে.।"

ফোন রেখে দিল ভিক্টর। "নোটন ?"

নোটন এসে হাজির হবার আগেই ভিক্টর উঠে পড়েছে। বলল, "আমি বেরোচ্ছি। তুই অফিস বন্ধ করে বাড়ি চলে যাস।"

নোটন হাত বাড়াল, "গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে যাও। দু-একটা জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে।"

ভিক্টর টাকা দিল নোটনকে। দিয়ে তার হালকা ওয়াটারপ্রুফ তুলে নিয়ে চলে গেল।

এখনও আলো ফুরোয়নি। রোদ পালিয়েছে। আকাশে হালকা মেঘ। বৃষ্টি হবার মতন মেঘ জমেনি কোথাও। ভিক্টর লিট্‌ল-জু-এ এসে হাজির।

সুনন্দন আর শাসমল অপেক্ষা করছিল। কাল যেখানে বসেছিল ভিক্টর, তার বিশ-পঁচিশ গজ দূরে লিটল-জু-এর অফিস। সাধারণ ঘর। মামুলি অফিস। টেবিল-চেয়ার ছাড়া যা তা সামান্যই। কাঠের পুরনো আলমারি, একটা টেলিফোন, দেওয়ালে টাঙানো কিছু ছবি—এই মাত্র।

ভিক্টর বলল, "সেই ভদ্রলোক কোথায় ?"

সুনন্দন বলল, "চলে গেলেন। বসানো গেল না।"

"ব্যাপারটা শুনি—।"

সুনন্দনই বলল, ভদ্রলোকের নাম মোহিনীমোহন পাল। বয়স বোধহয় পঞ্চাশের ওপর। উনি থাকেন বেলেঘাটার দিকে। সি আই টি রোড। ভদ্রলোকের একটা ট্রাভেলিং এজেন্সি আছে। মানে, ট্যুরিং কোম্পানি। বাসে ঘোরাঘুরির ব্যবস্থা করেন।"

"কী নাম এজেন্সির ?"

শাসমল একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন।

ভিক্টর কার্ড দেখল। 'ধরিত্রী ট্রাভেলস্'। অফিস ধর্মতলা স্ট্রিটে।

সুনন্দন বলল, "ভদ্রলোকের এক আত্মীয় অসুস্থ। হাসপাতালে রয়েছে। আত্মীয়কে দেখতে যেতেন ভদ্রলোক। গতকাল তিনি যখন আত্মীয়কে হাসপাতালে দেখতে যান তখন আত্মীয়টি তাঁকে একটি প্যাকেট দেন। বলেন, পাশের বেডে যে-লোকটি ছিল সে ছাড়া পেয়ে সকালের দিকে চলে গিয়েছে। যাবার আগে অনুরোধ করেছিল, এই প্যাকেটটা যদি ঠিকানামতন জায়গায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন তিনি—বড় ভাল হয়।"

ভিক্টর বলল, "মানে, যে পেশেন্ট ছাড়া পেয়ে হাসপাতাল থেকে চলে যাচ্ছে — সেই পেশেন্ট অন্য এক পেশেন্টকে অনুরোধ করেছিল।"

"হ্যাঁ।"

"প্যাকেটের ওপর নাম-ঠিকানা ছিল ?"

"হ্যাঁ। ভালভাবে প্যাক্ করা। ওপরে আমার নাম। 'লিটল জু' লেখা। ঠিকানাও ছিল।"

ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব আমাকে ফোনে বললেন, প্যাকেটের মধ্যে গানাসাহেবের হারানো ডায়েরিটা ছিল ?"

"হ্যাঁ, ডায়েরিটা আমার কাছে ফেরত এসেছে।"

ভিক্টর সুনন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুনন্দন বলল, "যে পাতাগুলো দরকার সেগুলো নেই। ছিঁড়ে বার করে নেওয়া হয়েছে।"

ভিক্টর বলল, "ডায়েরিটা কই ?"

"অফিসেই আছে। আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি, "বলে সুনন্দন টেবিলের ড্রয়ার দেখাল। দেখবেন ?"

ভিক্টর মাথা নাড়ল। দেখবে। বলল, "আগে চলুন, আপনাদের

লিটল-জু একবার দেখে আসি।"

"চলুন," সুনন্দন বলল। বলে শাসমলকে ডাকল।

অফিসঘর থেকে অন্তত গজ পঞ্চাশ দূরে লিটল-জু। পুরোপুরি গোল না হলেও প্রায় গোলমতন একটা জায়গা জাল দিয়ে ঘেরা। পাশের খানিকটা জায়গা একটানা জালের বেড়া দেওয়া। মাথার ওপরেও জালের চাঁদোয়া। দু-এক জায়গায় হয় টিন, না হয় অ্যাসবেসটাস। ভেতরে দু-একটা ছোট মাপের গাছপালা। অল্প-স্বল্প ঝোপঝাপ, মানে ঘাস আর লতাপাতার ঝোপ।

ভিক্টরের মনে হল, সেকেলে বড় বড় জমিদার বাড়ি— যাকে রাজবাড়ি বলা হত, সেইসব বাড়িতে এইরকম শখের চিড়িয়াখানা থাকত। দেখার মতন বিশেষ কিছু নেই। পাখিই এখানে বেশি। একজোড়া ময়ূর রয়েছে। গোটা বারো-চোদ্দ বানর। একটা ভালুক। রাজহাঁস গোটা চার।

ভিক্টর বলল, "আপনাদের ব্যবসা চলে কেমন করে?"

সুনন্দন বলল, "কোথায় আর চলে! ... পাখি কিছু বিক্রি হয়। প্রাইভেট অর্ডার থাকে। পাখিওলারাও খদ্দের ঠিক করে আমাদের কাছে এসে নিয়ে যায়। আমরা অবশ্য সার্কাসের অর্ডার পেলে জন্তুজানোয়ার জোগাড়ের ব্যবস্থা করি।"

"কেমন করে?"

"লোক আছে আমাদের। ... সাপ দেখবেন?"

"সাপ!"

শাসমল বললেন, "সাপের বিষ নিয়ে যাবার লোক আছে।"

ভিক্টর বলল, "না মশাই, সাপ আমি দেখব না। ওই জিনিসটি আমার একেবারে পছন্দ নয়।"

সুনন্দন বলল, "তা হলে চলুন, অফিসে ফিরি।"

"চলুন।"

অফিসে ফিরে শাসমল গেলেন বাড়ির দিকে, চায়ের কথা বলতে।

ভিক্টর একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসল। বলল, "ডায়েরিটা আমি দেখব। তার আগে দুটো কথা জেনে নিই। চুরি যাওয়া ডায়েরি আপনি ফেরত পেয়েছেন। পাননি ডায়েরির মধ্যের কিছু পাতা। আপনি কি এর

পরও ব্যাপারটা নিয়ে এগোতে চান ?”

সুনন্দন অবাক হয়ে বলল, “এগোব না ? বাঃ ! ··· ডায়েরির আসল জিনিসই তো চুরি গিয়েছে।”

ভিক্টর একটু পরে বলল, “যে ব্লু ডোয়ার্ফ বা নীল বামনের কথা ডায়েরিতে ছিল, তাদের সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে ?”

“আগে ছিল না। এখন খুবই আগ্রহ।”

“বাইরের সার্কাসপার্টির জন্যে ?”

“খানিকটা তাদের জন্যে ঠিকই। বাকিটা নিজের জন্যে।”

“কেন ?”

“ভাল করে ভাবিনি।”

ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে কয়েক টান সিগারেট খেল। বলল, “ওই যে ভদ্রলোক। কী নাম ··· আজ এসেছিলেন ··· ”

“মোহিনীমোহন পাল।”

“ভদ্রলোককে আপনি আগে কখনও দেখেছেন ?”

“না,” মাথা নাড়ল ভিক্টর।

“মানুষটিকে কেমন মনে হল ?”

সুনন্দন কী বলবে বুঝতে পারল না। শেষে বলল, “সাধারণ মানুষ যেমন হয়। খারাপ বলে তো মনে হল না। নয়তো বাড়ি বয়ে কেউ অন্যের দেওয়া জিনিস দিতে আসে !”

“তা ঠিক। ··· আচ্ছা, আপনারা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওঁর আত্মীয়ের পাশের বেডে যে রোগীটি ছিল তার নাম, বয়েস ? কেমন দেখতে ছিল ? কী অসুখ করেছিল তার। কতদিন ছিল হাসপাতালে ?”

সুনন্দন বলল, “শাসমলদা করেছিলেন।”

“আচ্ছা !”

“পাশের বেডে যে ছিল তার নাম জানা যায়নি। মানে, ভদ্রলোকের আত্মীয় জানেন না। বয়েস বছর চল্লিশের মতন। দিন পাঁচেক হাসপাতালে ছিল। রোগ তেমন কিছু নয়, হাই ফিভার। প্রথমে খারাপ ধরনের ম্যালেরিয়া মনে হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ম্যালেরিয়া। তবে খারাপ ধরনের নয়। পেশেন্ট নিজেই রিলিজ চেয়ে নিয়ে চলে গেল।”

"আর কিছু ?"

"না। আর কিছু বলতে পারলেন না ভদ্রলোক।"

"মোহিনীমোহন পালকে কোথায় পাওয়া যাবে ?"

"অফিসে। বাড়িতে।"

"তাঁর আত্মীয় কি এখনও হাসপাতালে ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে চলুন। কাল ভদ্রলোকের অফিসে যাওয়া যাক। সেখান থেকে হাসপাতালে।"

"আমি কি যেতে পারব ?"

"শাসমল যাবেন।"

"শাসমলদা পারবেন। ... আপনাকে ডায়েরিটা দেখাই।"

সুনন্দন ডায়েরি দেখাবার আগেই শাসমল ফিরে এলেন।

হাসপাতালের শরৎবাবু

মোহিনীমোহনের অফিস একেবারেই সাধারণ। ছোট মাপের দুটো ঘর। আসলে একটাই ঘর ; পার্টিশান করে দুটো খুপরি করা হয়েছে। একটায় বসেন মোহিনীমোহন আর ক্যাশবাবু। অন্যটায় এক কেরানিবাবু। অফিসের বেয়ারা নিতাইও টুল পেতে বসে থাকে। লোকজন যারা টিকিট কিনতে আসে তারা বসে ফোল্ডিং চেয়ারে।

মোহিনীমোহনের ব্যবসা হল, যাকে বলে—লাক্সারি বাসে করে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা করা। দূর পাল্লায় বাস ছোটে না, কাছাকাছি জায়গায় ঘোরাফেরা করে, দিঘা, বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটি—এইরকম আর কি ! দিঘার দিকেই তাঁর বাস বেশি চলে।

শাসমলকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্টর এল ধর্মতলা স্ট্রিটে, মোহিনীমোহনের অফিসে। তখন বিকেল ফুরোয়নি।

শাসমলকে চিনতে পারলেন মোহিনীমোহন। "আসুন।"

দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে শাসমল বললেন, "আপনার কাছেই এলাম। কালই বলেছিলাম, একটু বিরক্ত করতে আসতে পারি।" বলে শাসমল হাসির মুখ করলেন, যেন বিরক্ত করতে এসে লজ্জায় পড়েছেন।

মোহিনীমোহন বললেন, "বসুন।"

শাসমল ভিক্টরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মোহিনীমোহনের। বললেন, "ইনি কয়েকটা কথা জানতে এসেছেন। যদি দয়া করে বলেন, আমাদের বড় উপকার হয়। আমরা একটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়েছি।"

মোহিনীমোহন ভিক্টরের দিকে তাকালেন, "বলুন ?"

ভিক্টর গতকালই সব শুনেছিল শাসমলদের কাছে। তবু বলল, "আপনার আত্মীয় বা বন্ধু কোন্ হাসপাতালে আছেন ?"

"আজ জি কর হাসপাতালে।"

"কোন্ ওয়ার্ড, কত নম্বর বেড ?"

মোহিনীমোহন ওয়ার্ড বললেন। বেড নম্বরও।

নামটাও জেনে নিল ভিক্টর। বলল, "উনি এখনও আছেন হাসপাতালে ?"

"হ্যাঁ। কেন ?"

"আপনি কি আজও হাসপাতালে যাবেন ?"

"না, আজ যাব না। অন্য কাজ রয়েছে।"

ভিক্টর সামান্য ইতস্তত করে বলল, "আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা ছিল। একটু আড়ালে...," বলে আড়চোখে ক্যাশবাবুর দিকে তাকাল।

মোহিনীমোহন বুঝতে পারলেন। ক্যাশবাবুকে বললেন, "সরকার, তুমি বরং রায়বাবুর কাছ থেকে ঘুরে এসো। বলবে, সাতাশ বারো গাড়িটার কাজ হচ্ছে। দিন-চারেক লাগবে। তার আগে বুকিং নিতে পারছি না। যদি দিন-পাঁচেক পরে হলে চলে, আমাদের বাস পাওয়া যাবে।"

ক্যাশবাবু কাগজপত্র গুছিয়ে ক্যাশ বাক্সে চাবি দিয়ে উঠে পড়ল। যাবার সময় চাবিটা মোহিনীমোহনের সামনে রেখে দিল।

শাসমল বললেন, "পালবাবু, গতকালই আমরা আপনাকে বলেছিলাম, আমাদের একটা সাহায্য করতে হবে।.. ইনি ঘোষসাহেব, আমাদের কোম্পানির হয়ে একটা কাজ করছেন। আপনি যদি সাহায্য করেন— ।"

মোহিনীমোহন মানুষটিকে দেখলে সজ্জন বলেই মনে হয়। খানিকটা বয়েস হয়েছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পান খান। দাঁতে ছোপ ধরে গিয়েছে। চোখ দুটি বড়-বড়। ডান গালে মস্ত আঁচিল।

মোহিনীমোহন বললেন, "বলুন কী সাহায্য করতে পারি ?"

ভিক্টর বলল, "আপনি কতদিন ধরে হাসপাতালে আসা-যাওয়া করছেন ?"

"দিন-সাতেক।"

"আপনার আত্মীয় বা বন্ধুর কী অসুখ হয়েছে ?"

"ও আলসারের রোগী। মাঝে-মাঝেই ভোগে। এবার বাড়াবাড়ি হয়েছিল। এখন অনেকটা ভাল।"

"আপনি কি রোজই হাসপাতালে যান ?"

"না। রোজ পারি না।"

"শেষ কবে গিয়েছিলেন ?"

"পরশু।"

"পরশুই কি আপনি প্যাকেটটা পান ?"

"হ্যাঁ পরশু পাই। কাল আমার নিজের একটা কাজ ছিল ওদিকে। প্যাকেটটা নিয়ে গিয়েছিলাম।"

ভিক্টর সামান্য চুপ করে থাকল। দেখল একবার শাসমলকে। তারপর বলল, "আপনি যে হাসপাতালে যেতেন, আশেপাশের বেডের রোগীদের নিশ্চয়ই দেখেছেন ?"

"দেখেছি মানে চোখে পড়ত। ভিজিটিং আওয়ার্সে কত লোক যায়, তার মধ্যে কে রোগী কে ভিজিটার বোঝাও যায় না। সার্জিক্যাল ওয়ার্ড তো নয় মশাই যে, চট করে বোঝা যাবে !"

ভিক্টর বলল, "তার মানে আপনি ঠিক নজর করে দ্যাখেননি। আপনার আত্মীয়ের বেডের পাশে কোনও রোগী ছিল ?"

মোহিনীমোহন মাথা নাড়লেন। "না ; দেখিনি। ঠাওর করে দেখিনি। তবে এক ছোকরাকে দেখতাম, সে ভিজিটিং আওয়ার্সে বাইরের দু-একজনের সঙ্গে বারান্দার দিকে গিয়ে গল্প করত।"

"কেমন দেখতে ?"

"কেমন দেখতে !" মোহিনীমোহন যেন মনে করবার চেষ্টা করলেন ছোকরাকে। তারপর বললেন, "চেহারা খারাপ নয়। ছিপছিপে, গায়ের রং ময়লা, মুখের মধ্যে কেমন অবাঙালি ছাপ আছে।"

"নাম-ধাম ?"

"কিছুই বলতে পারব না।"

ভিক্টর শাসমলের দিকে তাকাল। বোঝাতে চাইল, এখানে বসে থেকে আর লাভ হবে না।

"আমরা আজ উঠি," ভিক্টর বলল। "আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম।" চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়ল সে। হঠাৎ কী মনে হল, বলল, "আপনার তো বাস-সার্ভিস। কত লোকজন বুকিংয়ের জন্যে আসে এখানে। আপনার কী মনে হয়, যে-ছোকরার কথা আপনি বলছেন, এ-রকম কাউকে এখানে কোনওদিন আসতে দেখেছেন ?"

মোহিনীমোহন কয়েক পলক তাকিয়ে মাথা নাড়তে গিয়ে আর মাথা নাড়লেন না। কী যেন ভাবলেন। পরে বললেন, "আমি মনে করতে পারছি না।"

শাসমলও উঠে পড়েছিলেন।

ভিক্টর বলল, "আসি।" বলে নমস্কার জানাল।

বাইরে এসে ভিক্টর বলল, "চলুন শাসমলসাহেব, হাসপাতালে যাওয়া যাক।" হাতের ঘড়িটা দেখল। পৌনে পাঁচ। আর· জি· কর পর্যন্ত যেতে-যেতে ছ'টা বেজে যাবে হয়তো। দেখা-শোনার পালা শেষ হয়ে যাবে ততক্ষণে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় ছয়। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে আসছে। লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল।

শাসমল বললেন,"চলুন, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। আমার সঙ্গে দু-একজনের চেনা আছে, যদি দেখতে পাই ঘাড় ধরে বার করে দেবে না।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মস্ত হলঘর।

ভিক্টর বেড নম্বর মিলিয়ে যাঁর কাছে এসে দাঁড়াল তাঁকে দেখে শাসমল অবাক। চেনা মানুষ মনে হচ্ছে।

শাসমল বললেন,"শরৎবাবু না ?"

ভদ্রলোকও শাসমলকে দেখছিলেন। "আপনি ?"

"কাণ্ড দেখুন," শাসমল বললেন, "আপনি যে মোহিনীবাবুর আত্মীয় কেমন করে বুঝব ?"

শরৎবাবু বললেন, "মোহিনী সম্পর্কে আমার ভাই হয়। কাজিন। বন্ধুও। .কী ব্যাপার বলুন তো ? এদিকে হঠাৎ ?"

শাসমল বললেন, "মোহিনীবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই আসছি।"

ভিক্টর শরৎবাবুকে দেখছিল। মোহিনীবাবুর সমবয়েসী বলেই মনে হয়। তবে রোগা চেহারা। অসুখ-বিসুখের দরুন খানিকটা বুড়োটে দেখায়। সাদামাটা ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

শাসমল ভিক্টরকে বললেন,"শরৎবাবু আমার চেনাজানা। ওঁর গ্যারাজ রয়েছে তেলকলের কাছে। গাড়ি সারাই হয়।"

শরৎবাবু ভিক্টরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মানুষটিকে তিনি চেনেন না। সন্দেহের চোখেই দেখছিলেন ভিক্টরকে।

শাসমল বললেন,"আমরা একটা খোঁজ নিতে এসেছি, শরৎবাবু। আপনার পাশের বেডে এক পেশেন্ট ছিল। চলে যাবার সময় সে একটা প্যাকেট দিয়ে যায় আপনাকে। প্যাকেটটা আপনি মোহিনীবাবুকে দিয়েছিলেন ঠিকানামতন জায়গায় পৌঁছে দিতে।"

শরৎবাবু বললেন, "হ্যাঁ, কাশীপুরের ঠিকানা। জু "

"লিট্‌ল জু।"

"মনে পড়ছে।"

"আমি ওখানে কাজ করি।"

শরৎবাবু কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। পরে অবাক হয়ে বললেন, "তাই নাকি মশাই। আমি জানতাম আপনি গ্রে স্ট্রিটে কোনও একটা রেডিওর দোকানে বসেন।"

শাসমল হেসে বললেন, "আমার ছোট ভাইয়ের ব্যবসা ; 'সুর ও স্বর'। রেডিও-রেকর্ডের দোকান। আমি মাঝে-মাঝে সন্ধের দিকে বসি।'

"ও ! তাই বলুন !"

ভিক্টর শাসমলকে ইশারা করল। ওয়ার্ডে ঘণ্টি পড়ছে। এবার আর থাকতে দেবে না ভিজিটারদের।

শাসমল বললেন," যে লোকটি আপনাকে প্যাকেটটা দিয়েছিল তার নাম জানেন ?" বলে শরৎবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

শরৎবাবু সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন না। ভেবে বললেন, "নাম তো বলতে পারব না। ওকে চৌধুরী বলে ডাকত।"

"কেমন দেখতে ?"

শরৎবাবু বর্ণনা দিলেন চেহারার। মোহিনীমোহনের বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল প্রায়। নতুন করে যা জানা গেল, তা হল চৌধুরীর চোখের তারা কটা রঙের। নাক লম্বা, খাড়া নাক বলতে যা বোঝায়।

"বাঙালি ?"

"স্পষ্ট বাংলা কথা, মশাই। দেখলে অবশ্য কেমন যেন মনে হয়। দেওঘরের লোক বলল।"

"দেওঘর ?"

"বলল, কলকাতায় কাজে এসেছিল। ছিল বন্ধুর বাড়ি। হঠাৎ ম্যালেরিয়া ধরে গেল। বেদম জ্বর। বন্ধুর বাড়িতে দেখাশোনার লোক নেই। ডাক্তার বলল, হাসপাতালে ভর্তি হতে। জ্বরটা ম্যালিগনান্ট টাইপের হয়ে উঠছিল। ও হাসপাতালে চলে এল। অবশ্য দেখা গেল, মামুলি ম্যালেরিয়া।"

ভিক্টর বলল, "আপনার কাছে প্যাকেট দিয়ে গেল কেন ?"

শরৎবাবু একটু ভেবে বললেন, "কী জানি ! আমি শ্যামবাজার বেলগাছিয়ার দিকে থাকি শুনেই বোধহয়। বলল, ও আজই দেওঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমি যদি দয়া করে প্যাকেটটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি—বড় ভাল হয়।"

"প্যাকেটে কী আছে সে বলেনি ?"

"বলেছিল, একটা বই আছে। জরুরি বই।"

"প্যাকেট আপনি দ্যাখেননি ?"

"না," শরৎবাবু মাথা নাড়লেন। "পোস্ট অফিসের রেজিস্ট্রি প্যাকেটের মতন চারদিক মোড়া ছিল, কেমন করে দেখব !"

ভিজিটিং আওয়ার্সের শেষ ঘণ্টি বেজে গেল। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

ভিক্টর বলল, "ওর কাছে লোকজন আসত শুনলাম ?"

"তা আসত।"

"কারা ?"

"বন্ধুবান্ধব বোধহয়।"

"তাদের কাউকে আপনি চেনেন না ?"

"না।"

"মোহিনীবাবু বলছিলেন, ওরা নাকি বারান্দায় গিয়ে গল্পগুজব করত ?"

"হ্যাঁ। লোক এলে ও বাইরে চলে যেত।"

ওয়ার্ডের মধ্যে আর কোনও ভিজিটার নেই। ভিক্টরের মনে হল, এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শাসমলকে বলল, "চলুন, আমরা যাই।"

শরৎবাবু বললেন শাসমলকে, "কী ব্যাপার, মশাই ? আপনারা হঠাৎ ?"

শাসমল বললেন. "তেমন কিছু নয়। একটু খোঁজখবর করতে এসেছিলাম। পরে আবার দেখা হবে শরৎবাবু ! আজ আসি।"

শাসমল আর ভিক্টর দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

হাসপাতালের ফটক পর্যন্ত স্কুটার ঠেলতে-ঠেলতেই এল ভিক্টর। তারপর বলল, "নিন, বসুন। আপনাদের দিকেই যাওয়া যাক।"

ভিক্টর স্কুটারে স্টার্ট দিল। শাসমল বসলেন পেছনে।

"আপনি চৌধুরীর নাম-ঠিকানা জোগাড় করতে পারবেন শাসমল সাহেব ?" ভিক্টর বলল, "আপনার সঙ্গে ডাক্তারদের দু-একজনের চেনা আছে বলছিলেন ?"

শাসমল বললেন, "পারব। রোগীর টিকিট কাটা হয়েছিল, খাতা রয়েছে।"

"নাম-ঠিকানা জোগাড় করুন। তবে ফলস্ নাম-ঠিকানা দিয়ে ভর্তি হলে..."

"দেখি। খোঁজ করি আগে।"

খালপারের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে ভিক্টর বলল, "আমি একটা

জিনিস নজর করেছি। আপনি কি কিছু লক্ষ করেছেন ?”

শাসমল বললেন, “না। কী বলুন তো ?”

ভিক্টর বলল, “শরৎবাবু কথা বলার সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। মনে হল, উনি ঝট করে কিছু বলছেন না।”

শাসমল বললেন, “আমি বুঝতে পারিনি। অসুস্থ মানুষ !”

“উনি আপনার পরিচিত বললেন। অথচ উনি জানেন না, আপনি লিটল্ জু-এর লোক। বরং বললেন, আপনার নাকি গ্রে স্ট্রিটে রেডিও-রেকর্ডের দোকান !”

শাসমল বললেন, “আমার ভাইয়ের দোকানে আমাকে উনি দেখেছেন। ভুল বুঝেছেন। কিন্তু আপনি বলার পর আমার এখন খেয়াল হচ্ছে, শরৎবাবুর গ্যারাজে আমি অন্তত বার দুই সুনন্দনের জিপ গাড়ির কাজ করিয়েছি। ছোটখাটো কাজ। শরৎবাবুর তো জানা উচিত ছিল, লিটল জু-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে।”

ভিক্টর কোনও কথা বলল না।

খালপারের রাস্তা দিয়ে সোজা যেতে-যেতে ভিক্টর আচমকা ব্রেক করল। রাস্তা ভাল নয়। বিরাট এক গর্ত সামনে। নিজেকে সামলে নিয়ে গর্তের পাশ কাটিয়ে আবার এগিয়ে গেল সে।

শরৎবাবু মানুষটিকে দেখতে যত সাদামাটা, নিরীহ ভদ্রলোক বলে মনে হয়, হয়তো আসলে উনি ততটা নন। কে বলতে পারে, ভদ্রলোক মিথ্যে কথা বলছেন না ? হয়তো ওঁর পাশের বিছানায় যে রোগীটি ছিল—তার সঙ্গে ডায়েরির কোনও সম্পর্ক নেই। সবটাই বানানো গল্প।

শরৎবাবুর পাশের বেডে কে ছিল, তার ঠিকানা কী, এটা জেনে নেওয়া খুব মুশকিলের হবে না। যদি দেখা যায়, শরৎবাবুর কথার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই তা হলে একটা সূত্র ধরে এগোনো যেতে পারে।

“শাসমলসাহেব ?”

“বলুন ?”

“শরৎবাবুর সঙ্গে সুনন্দনের আলাপ আছে ?”

“না, আমি তো জানি না।”

ভিক্টর আর কথা বলল না। দমকা বাতাস এল। ধুলো উড়ল। খালের

গা বরাবর ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলোর মাথার ওপর অন্ধকার নেমেছে। আকাশের চেহারা পালটে আসছিল। মেঘ জমছে।

লিটল জু-এর সামনে এসে স্কুটার থামাতেই ভিক্টরের চোখে পড়ল সুনন্দন বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

শাসমল আগেই নেমে পড়লেন। স্কুটার রাখতে রাখতে ভিক্টর ইশারায় সুনন্দনদের দিকে দেখাল। "ভদ্রলোক কে?"

"সুনন্দনের মামাতো ভাই প্রমথ।"

"ও!... কী করেন ভদ্রলোক?"

"আগে করত। এখন তেমন কিছু করে না।"

"কী করতেন আগে?"

"জাহাজের মাল খালাসের সাব কনট্রাক্টারি গোছের কিছু করত। পয়সাকড়ি পকেটে ছিল একসময়, বাপের সম্পত্তি পেয়েছিল। সে সমস্ত কবেই ফুরিয়ে গিয়েছে মামলা-মোকদ্দমায়। নিজেও বেহিসেবি। চালিয়াত গোছের। বদসঙ্গ রয়েছে। ছোকরা ভাল নয়, ঘোষসাহেব।"

ভিক্টর কথা বলতে বলতে সুনন্দনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। সুনন্দনও এগিয়ে এল। সামনাসামনি এসে দাঁড়াল ওরা।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে ভিক্টর বলল, "দু'জায়গা ঘুরে এলাম। চলুন, আপনার সঙ্গে বসি।"

ভিক্টর যেন ইচ্ছে করেই প্রমথকে উপেক্ষা করল।

সুনন্দন বলল. "চলুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। আমার মামাতো ভাই প্রমথ।"

ভিক্টর তাকাল। দায়সারাভাবে বলল, "আচ্ছা!"

প্রমথ কোনও কথা বলল না। তার মুখ দেখে মনে হল সে রীতিমতন চটে গিয়েছে।

ভিক্টর গ্রাহ্য করল না।

নীল বামন না ধোঁকাবাজি !

বাইরে বৃষ্টি নেমে গিয়েছিল।

ভিক্টর অনেক আগেই বাড়ি ফিরেছে। বৃষ্টি নামার পর বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে পুবের দিকের জানলা বন্ধ করে দিল। ছাট আসছে জলের।

বিছানায় ফিরে আসার আগে ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে তার ঘরের টেবিলের সামনে সামান্য দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় ফিরে এল আবার।

গানাসাহেবের ডায়েরিটা মোটামুটি দেখার পর তার মনে হয়েছে, সাধাসিধে, সরল এক মানুষের মনের কথা হিসেবেই ডায়েরিটার যা মূল্য। এটাকে সাহিত্য বলা যাবে না, সাহেবের রোজনামচাও বলা যায় না। বড়জোর বলা যেতে পারে 'মনে এল' গোছের রচনা। কিন্তু ডায়েরির জাতবিচার ভিক্টরের কাজ নয়। তার কাজ চোর ধরা।

ভিক্টরের অভ্যেস হল, গোয়েন্দাগিরি করার আগে খানিকটা অঙ্ক কষে নেওয়া। সব গোয়েন্দাই সেটা করে। তবে এক-একজন এক-একরকম ভাবে অঙ্কটা ছকে নেয়। যার যেমন অভ্যেস।

ভিক্টর মোটামুটিভাবে যে-ছক সাজাচ্ছে তাতে সে দেখছে, সুনন্দনের ঘর থেকে ডায়েরি চুরি, সেই ডায়েরি আবার ফেরত পাওয়ার মধ্যে একটা বিচিত্র রহস্য রয়েছে। রহস্যটা হল, ডায়েরির মধ্যে থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে নেওয়া।

প্রশ্ন হল, যে লোকটা ডায়েরি চুরি করেছে সেই কি ডায়েরি ফেরত দিয়েছে ? যদি দিয়ে থাকে তা হলে চুরি করতে গেল কেন ? ধরে নেওয়া যাক, চোর খুবই সজ্জন, পরের জিনিস না বলে নেয়, আবার ফেরতও দেয়। বেশ, ফেরত দিক। কিন্তু, ফেরত দেবার সময় বিশেষ কিছু পাতা বেমালুম ছিঁড়ে নেবে কেন ?

ভিক্টর এই ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। ডায়েরি চুরি করেছে যে লোকটি সে তো ইচ্ছে করলেই তার প্রয়োজনীয় পাতাগুলো নকল করে নিতে পারত। ফোটো কপি, জেরক্স— কত কী রয়েছে আজকাল। হুবহু নকল হয়ে যেত। সহজ কাজ সহজভাবে না করে পাতাগুলো ছিঁড়তে

গেল কেন ডায়েরি-চোর ?

এর একটা সহজ জবাব দেওয়া যেতে পারে। চোর মোটেই চায় না, সুনন্দনের হাতে পাতাগুলো ফেরত দিতে। অর্থাৎ সুনন্দন যেন ওই পাতাগুলো থেকে কোনও ফায়দা না লুঠতে পারে। বা পাতাগুলোয় যা-যা আছে সেগুলোর কোনও সাহায্য না নিতে পারে। সোজা কথায় সুনন্দনকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য করা।

ভিক্টর আজ সুনন্দনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছে, গানাসাহেব নীল বামন সম্পর্কে যা-যা লিখেছেন, তার দশ আনাই সুনন্দনের মনে থাকলেও ছ' আনা নেই। কিছু-কিছু জিনিস ভাল করে খেয়াল করেনি সুনন্দন। তা ছাড়া ওই লেখার মধ্যে গানাসাহেব একটা নকশা করেছিলেন পেনসিল করে। নকশাটা জরুরি। তার মধ্যে দেখানো আছে ঠিক কোন্ জায়গায় তিনি নীল বামনদের দেখেছিলেন। সুনন্দন এই নকশা মনে করতে পারছে না।

ব্যাপারটা তা হলে এই দাঁড়াচ্ছে, সুনন্দনরা যাতে নীল বামনদের খোঁজ করতে না পারে তার জন্যে প্রয়োজনীয় পাতাগুলো ছিড়ে ওরা রেখে দিয়েছে—চোরের দল— বাকিটা ফেরত দিয়েছে। না দিলেই বা কী ক্ষতি ছিল!

এরপর আসে অন্য কথা। সুনন্দনদের লিটল জু দেখে ভিক্টরের মনে হয়নি, ব্যবসাটা অর্থকরী। আগে হয়তো ছিল, কিন্তু এখন নয়। না হবার বড় কারণ, খদ্দের ছাড়া ব্যবসা হয় না। সুনন্দনের কপালে এখন পশুপাখি কেনার খদ্দের জোটে না। অন্য কারণ, আজকাল জঙ্গলে গিয়ে পশুটশু ধরাও বেআইনি। নিষেধ রয়েছে সরকারের। সুনন্দন অবশ্য এই দুটো কথাই স্বীকার করেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, বাবার আমলে যা ছিল তারই অবশিষ্টটুকু নিয়ে সুনন্দনের লিটল জু বেঁচে আছে। কদাচিৎ এক-আধটা নতুন কিছু জুটে গেলে অন্য কথা।

ভিক্টর স্পষ্টই বুঝতে পারছে, সুনন্দনের আর্থিক অবস্থা এখন তেমন ভাল নয়। ভাঙা কাঠামোর ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে। টাকা তারও দরকার।

এমন হতেই পারে, নীল বামন ভাঙিয়ে সুনন্দনও একটা মোটা টাকা রোজগারের স্বপ্ন দেখছিল। অবশ্য তা সম্ভব কি না সেটা অন্য কথা। বনের পশুপাখিকে যদি-বা লুকিয়ে চুরিয়ে ধরা যায়— মানুষকে কেমন করে ধরবে সুনন্দনরা!

ভিক্টর রীতিমত ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছিল।

ডায়েরি চুরি এবং ফেরতের অংশটাকে যদি 'ক' বলে ধরা যায়, তা হলে 'খ' হল মোহিনীমোহন, শরৎবাবু, হাসপাতাল এবং এক—'চৌধুরী'-র অংশটা। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে, তবে কী ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা ভিক্টর এখনও ধরতে পারছে না।

হঠাৎ কী মনে করে ভিক্টর নোটনকে ডাকল চেঁচিয়ে।

নোটন এল সামান্য পরে।

"কী করছিলি?"

"দিদির সঙ্গে গল্প করছিলাম।"

"গল্প করছিলি, না, সিনেমার কাগজ দেখছিলি?"

নোটন হাসল। বলল, "বই পড়ছিলাম, 'প্রেতাত্মার কান্না'।"

নোটন গোয়েন্দা-বই আর সিনেমা-কাগজের পোকা।

ভিক্টর বলল, "প্রেতাত্মা সাজতে পারবি?"

নোটন মাথা নাড়ল। বলল, "না। কালো আলখাল্লা পরতে পারব না।"

ভিক্টর হেসে উঠল।

খানিকটা পরে ভিক্টর বলল, "তোকে ক'দিন কলকাতার বাইরে পাঠাতে চাই। যাবি?"

নোটন বলল, "কবে?"

"ধর, পরশু-তরশু।"

মাথা নাড়ল নোটন। বলল, "এই হপ্তায় মোহনবাগানের দুটো খেলা আছে। রেলের সঙ্গে আর এরিয়ান্সের সঙ্গে, রেল ভাল টিম। আমি কেমন করে যাব?"

ভিক্টর বলল, "খেলা পরে। তোর মোহনবাগান রেলের সঙ্গে ড্র করবে। তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।"

ড্র-এর ব্যাপারটা নোটনের ঠিক পছন্দ নয়। তবে হেরে যাওয়ার চেয়ে ভাল। গতবার রেলের কাছে হেরে গিয়েছিল মোহনবাগান। এবার অন্তত জেতা উচিত।

নোটন বলল, "তুমি যাবে?"

ভিক্টর বলল, "যেতে পারলে ভাল হত। দেখি, পারি কি না! আমি না পারলে তুই একলাই যাবি।"

"কোথায়?"

"ঢালপাহাড়ি।"

নোটন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। এমন নাম সে জীবনেও শোনেনি। বলল, "জায়গাটা কোথায়?"

ভিক্টর নিজেও জানে না জায়গাটা কোথায়? সুনন্দনের মুখে যেমনটি শুনেছে তাতে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না ঢালপাহাড়ি ঠিক কোথায়। আভাসে যতটা পারল বলল।

নোটন বলল, "যাব।"

ভিক্টর বলল, "ঠিক আছে, এখন তুই প্রেতাত্মা পড়তে যা। আমি ভেবে দেখি।"

নোটন চলে গেল।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। বাদলা ভিজে বাতাস আসছে হুহু করে। ভিক্টর মাথার তলায় হাত রেখে ছাদ-মুখো হয়ে শুয়ে থাকল।

হঠাৎ তার মনে হল, কলকাতায় বসে-বসে চোর ধরার চেষ্টা করার চেয়ে একবার ঢালপাহাড়ি যাওয়া বোধহয় ভাল। ভাল এই জন্যে যে, গানাসাহেব যা লিখে গিয়েছেন তার কতটা সত্যি আর কতটা তাঁর ভ্রম তা জানা দরকার। যদি ধরেও নেওয়া যায়, নীল বামন বলে কিছু ছিল— তা হলেও দেখতে হবে—এতকাল পরেও তার অস্তিত্ব আছে কি না! না থাকাই স্বাভাবিক। যদি নাই থেকে থাকে তবে আচমকা বামন নিয়ে মাথা ঘামানো কেন?

ভিক্টরের কেমন সন্দেহ হতে লাগল, প্যান্থার সার্কাস, সিঙ্গাপুর— এসব বানানো কথা নয় তো!

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ভিক্টর। ঘরের মধ্যে পায়চারি করল

বারকয়েক, তারপর সোজা বারান্দায় চলে গেল।

বারান্দার একপাশে ফোন। ভিক্টর ফোন তুলে নিল।

বারকয়েক চেষ্টার পর সুনন্দনকে পাওয়া গেল।

ভিক্টর বলল, "আমি ভাবছি, একবার স্পটে যাব।"

"স্পট ?"

"ঢালপাহাড়ি। নিজের চোখে জায়গাটা একবার দেখে আসতে চাই।"

ওপাশে সুনন্দন যেন থমকে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, "যেতে পারবেন ?"

"না পারার কী রয়েছে ! আমি আমার লোক সঙ্গে নিয়ে যাব। আপনি নিশ্চয় যেতে পারবেন না চোখের যা অবস্থা। শাসমলসাহেব আমাদের সঙ্গে যাবেন।"

সুনন্দন রাজি হয়ে গেল, "কবে যাবেন ?"

"ভাবছি পরশু।"

ফোনের লাইনে খরখর শব্দ হতে লাগল। সুনন্দনের গলা ভাল করে শোনা যাচ্ছিল না।

ভিক্টর বলল, "আপনি আমাকে একটা ম্যাপ এঁকে দেবেন।... না না, যতটুকু আপনার মনে আছে। তারপর কী করা যায়—আমরা ওখানে গিয়ে ভেবে দেখব।"

সুনন্দন ওপাশ থেকে বলল, "শাসমলদা মানে বলাইদা কাল এখানে এলে আমি কথা বলব। আপনার সঙ্গে দেখা করবেন উনি। কিন্তু মিস্টার ঘোষ, জায়গাটা খুঁজে বার করা বোধহয় কঠিন হবে। ম্যাপ থাকলে সুবিধে হত। ডিটেল আমার মনে নেই।"

ভিক্টর বলল, "চেষ্টা করা যাক।"

"করুন।"

"একটা কথা আপনি ভেবে দেখেননি। যারা ডায়েরি চুরি করেছিল তারা হয়তো এরই মধ্যে ঢালপাহাড়ি পৌঁছে গিয়েছে। অবশ্য যদি তারা কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে ডায়েরিটা চুরি করে থাকে। যাই হোক, আমরা যাচ্ছি। আপনি শাসমলকে কাল পাঠিয়ে দেবেন অফিসে।" কথা শেষ করে ভিক্টর ফোন নামিয়ে রাখল।

দিদির ঘরে আলো জ্বলছিল।

দিদি এসময় হয় বইপত্র মুখে করে বসে থাকে, নয়তো নিজের মনে রেডিও শোনে।

ভিক্টর কয়েক পা এগিয়ে দিদির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

"কী রে ?" দিদি বলল। বলে হাতের বই পাশে রেখে উঠে বসল।

ভিক্টর বলল, "পরশুদিন একবার বাইরে যাব।"

"বাইরে ? কোথায় ?"

"তেমন দূরে নয়। ওই আসানসোল-আদরার দিকে।"

"কেন ?"

"একটা কাজ হাতে নিয়েছি। ... নোটনকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোর খানিকটা অসুবিধে হবে।"

দিদি মাঝে-মাঝে ভিক্টরের কাজকর্ম পছন্দ করে না। বলল, "অসুবিধে নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। কচির মা আছে, পাশের বাড়ির কাকাবাবু আছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি, তুই যাবি কোথায় ? কেন ?"

ভিক্টর বিছানায় বসল। খুব সংক্ষেপে নীল বামনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "জায়গায় গিয়ে একবার দেখে আসতে চাই।"

দিদি কথার জবাব দিল না কিছুক্ষণ, তারপর ঠাট্টার সুরে বলল, "নীল বামন তোদের জন্যে বসে আছে ! অনর্থক যাবি।"

"তাই মনে হয়।"

"গিয়ে দেখবি, কোথাও কিছু নেই। এ কি তোর রূপকথার গল্প ! সাত কলসি মণি-মানিক-মোহর নিয়ে চারটে সাদা বাঁদর চারদিক ঘিরে এক যক্ষের ধন পাহারা দিচ্ছে। বাঁদরগুলো চার প্রহরে চার রকম রং পালটায়।"

ভিক্টর প্রথমে কান করেনি, হেসে উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। দিদির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "যক্ষের ধন।" বলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, হতে পারে। সাত কলসি না হোক, দু-তিন কলসি মোহরও যদি ওখানে লুকনো থাকে—তার তো লাখ টাকা দাম হবে। দিদি, তুই তো আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলি।"

ভিক্টর লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল, যকের ধন থাক আর না থাক— ওই জায়গায় কোনও কিছু থাকা সম্ভব—যার অনেক মূল্য। নীল বামন হয় গল্পকথা, না হয় ধোঁকাবাজি।

ঢালপাহাড়ি

ঢালপাহাড়ি নামের সঙ্গে জায়গাটার কিছু মিল আছে। চারদিকে তাকালে মনে হয়, দূরে পাহাড়ের যে ঢল নেমেছে তারই একেবারে পায়ের তলায় এই জায়গাটা। পাহাড়তলির মতনই। কাছাকাছি কোনও রেল স্টেশন নেই। মাইল তিন দূরে বাস রাস্তা। বাস মোড়ে ছোট বাজার, অল্প লোকবসতি। সেখান থেকে হয় পায়ে হেঁটে ঢালপাহাড়িতে আসতে হয়, না হয় গোরুর গাড়ি। অবশ্য মুদি আর কাঠগোলার মালিক ভানুবাবুর একটা ভাঙা জিপ আছে বাস মোড়ে। ভাড়া চাইলে পাওয়া যায়। তবে জিপের যা চেহারা, দেখলে মনে হয় আধ মাইলটাক যেতে-না-যেতে তার চাকাগুলো খুলে বেরিয়ে যাবে।

ভিক্টররা ঝুঁকি নিয়ে জিপটাই ভাড়া করেছিল। তাদের কপাল ভাল, ঢালপাহাড়িতে পৌঁছেও গেল। কিন্তু জিপ থেকে নামার পর বুঝতে পারল, বড়ই বেজায়গায় এসে পড়েছে। থাকার কোনও জায়গা নেই।

পাহাড়তলির দু-দশঘর গরিব মানুষ থাকে ঢালপাহাড়িতে। জঙ্গলের কাঠকুটো কুড়িয়ে বেড়ায়, শালপাতা কুড়োয়, নিজেদের কুঁড়ের সামনে অল্পস্বল্প সবজি ফলায়, পেটে ভাত জোটে না বছরের মধ্যে ছ'মাস, বনে-জঙ্গলে যা জোটে তাই খেয়ে বাকি সময়টা কাটিয়ে দেয়।

শাসমল বললেন, "ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা ডাকবাংলোর কথা ভানুবাবু বললেন যে?"

জিপের ড্রাইভার বলল, "কোঠি।"

"কোথায় কোঠিটা?"

ড্রাইভার আঙুল দিয়ে দূরে কী দেখাল, তারপর বলল, তার জিপ ওখানে যেতে পারবে না। চড়াই পথ, রাস্তাও খারাপ।

ভিক্টর বুঝতে পারল, ড্রাইভারকে আর আটকানো যাবে না। টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় দিল। যাবার সময় বলে দিল, এদিক দিয়ে

যদি যায় আবার যেন খোঁজ করে।

পাহাড়তলির দু-দশজন ভিক্টরদের ঘিরে ধরেছিল। "বাবুরা কোত্থেকে এসেছেন গো?"

শাসমল তাদের সামলালেন।

তারপর ডাকবাংলোর খোঁজে এগিয়ে চলল। তিনজনের হাতে-কাঁধে মালপত্র ঝোলাঝুলি। ভানুবাবু বলেই দিয়েছিলেন, 'চাল ডাল আলু চা চিনি কিনে নিয়ে যান মশাই। ওখানে কিছু পাবেন না। ডাকবাংলোয় চাপরাসি আছে, রান্নাটা করে দিতে পারবে, পয়সা দেবেন।'

সিকি মাইলের মতন পথ হাঁটার পর একটা ছোট মতন বাড়ি দেখা গেল। কাঠের বাড়ি, মাথায় টালি। দেখতে মন্দ লাগছিল না।

এদিকেও সবে বর্ষা নেমেছে। আবহাওয়া মেঘলা। মাঝে-মাঝে মরা রোদ উঁকি দিচ্ছিল। গাছপালা বন-জঙ্গলের জন্যে জায়গাটা ঠাণ্ডা। ছায়া ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে।

বাড়িটার কাছে এসে শাসমল বললেন, "ডাকবাংলো নয় ঘোষসাহেব, বিট্ বাংলো।"

ডাকবাংলো, বিটবাংলো যাই হোক— মাথা গোঁজার জায়গাটাই এখন প্রয়োজন। ভিক্টর মাথা ঘামাল না।

চৌকিদার ছিল। মানুষটার চেহারা দেখলে মনে হয়, এক সময় বোধহয় আসল সেপাই ছিল, এখন বুড়ো হয়ে তালপাতার সেপাই হয়ে গিয়েছে। যেমন লম্বা, তেমনই কুচকুচে কালো। মাথার চুল সাদা। মস্ত গোঁফ। পেকে সাদা। হাতে লোহার বালা। ডান কানে রুপোর আংটা।

চৌকিদার তার নাম বলল, লছুয়া।

বাঙালি নয়, তবু বাংলাতেই কথাবার্তা বলে। মাঝে-মাঝে হিন্দি মেশায়। শুনতে মন্দ লাগে না।

লছুয়া ঘর খুলে দিল। ঘর খোলার বকশিস দশ টাকা। দেড়খানা ঘর। একটা ঘর শোবার, অন্যটা খাওয়াদাওয়ার। পেছনে বাথরুম। সামনে বারান্দা। কাঠের জাফরি ঘেরা। লতাপাতা জড়িয়ে জাফরিটা বাহারি দেখায়।

লছুয়া বলল, সে হল বিট-বাংলোর চৌকিদার। একজন বিটবাবুও

আছে এখানে। কেশববাবু। সকালবেলায় খাকি পোশাক চাপিয়ে সাইকেল নিয়ে জঙ্গলে বিট দিতে যায়। দুপুরে ফেরে।

ভিক্টর জল খেতে চাইল।

জল এনে দিল লছুয়া। কুয়ার জল। স্বাদ রয়েছে।

ভিক্টর নোটনকে বলল, "তুই ওকে নিয়ে ম্যানেজ কর। আগে একটু চা খাওয়া দরকার।"

লছুয়া বলল, মোটামুটি বাসনপত্র, চায়ের কেটলি, কাপ, প্লেট সবই এখানে আছে। কখনও কখনও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাহেবরা এখানে এসে হাজির হন। তাঁদের জন্যে ব্যবস্থা করা আছে। সরকারি ব্যবস্থা।

নোটন রান্নাবান্নার চাল ডাল আলু চা চিনি বার করে লছুয়াকে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ লছুয়া বলল, "বাদমে বুঝে লেব। চা-পাত্তি থোড়া আছে বাবু। আমি চা লিয়ে আসছি। ওই বাবুরা আধা প্যাকিট চা, এক ডিব্বা শকার ফেলে গেছেন।"

ভিক্টর বলল, "কোন বাবু? ফরেস্টবাবু?"

"না। দো বাবু। কালকাত্তা শহরসে এসেছিলেন।"

ভিক্টর কেমন সন্দেহের চোখে লছুয়াকে দেখল; তারপর শাসমলের দিকে তাকাল।

শাসমলও খানিকটা অবাক হয়েছিলেন।

ভিক্টর বলল লছুয়াকে, "বাবুরা বেড়াতে এসেছিলেন?"

মাথা নাড়ল লছুয়া। বলল, "কামে এসেছিলেন। সিনেমাকা বাবু। বললেন, জঙ্গল দেখতে এসেছেন। সিনেমাকা তসবির তুলবেন।"

শাসমল বললেন, "সিনেমার বাবু? কী নাম, জানো?"

লছুয়া বলল, "খাতামে লেখা আছে। সাব, আপলোক ভি নামটা লিখিয়ে দিন। সরকারকা আইন।" বলে লছুয়া গেল খাতা আনতে।

ভিক্টর বুঝতে পারল, সরকারি ব্যাপার। এখানে থাকতে হলে খাতাপত্রে নাম লিখতে হবে।

লছুয়া গিয়েছিল খাতা আনতে। ঘরে ভিক্টররা তিনজন। ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, আমরা কি লেট করলাম?"

শাসমল বললেন, "দাঁড়ান। আগে দেখি খাতাটা।"

নোটন বলল, "সিনেমার লোক শুটিংয়ের জায়গা দেখতে এসেছিল ? এখানে ? এত দূরে ?"

খাতা নিয়ে এল লছুয়া।

লম্বা খাতা। দেখলে মনে হয়, বছর কয়েকের পুরনো। লছুয়ার মতনই তার রোগা-পাতলা চেহারা। পাতাগুলো ছিঁড়ে আসছে। নানা ধরনের নাম পাতায়। তবে বেশি নয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাবুদেরই আসা-যাওয়া বেশি।

শাসমল খাতা নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। ভিক্টর তার পাশে।

"এই যে ঘোষসাহেব !" বলে শাসমল শেষ নামটা দেখালেন, "ডি· মিত্র অ্যান্ড ফ্রেন্ড।"

ভিক্টর নামটা দেখল। নামের পাশে ঠিকানা। কলকাতার পার্শিবাগান। বাড়ির নম্বরও রয়েছে।

ভিক্টর বলল, "আপনি আপনার নাম লিখে দিন, বলাই শাসমল অ্যান্ড পার্টি।"

শাসমল পকেট থেকে ডট পেন বার করে খাতায় নাম লিখতে লাগলেন।

ভিক্টর লছুয়ার দিকে তাকাল। "বাবুরা কতদিন ছিলেন ?"

লছুয়া হিসেব করে বলল, "চার দিন।"

"গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন ?"

"ভটভটিয়া।"

খাতাটা ফেরত দিতে দিতে শাসমল বললেন, "বাবুরা শুধুই ঘুরলেন ফিরলেন না, ফোটো তুললেন ?" বলে শাসমল ফোটো তোলার নকল করে দেখালেন।

লছুয়া যা বলল, তাতে মনে হল, কাঁধে ঝোলানো এক ক্যামেরা ওদের কাছে ছিল।

ভিক্টর বলল, "কবে ফিরে গেলেন বাবুরা ?"

"কাল চলে গেলেন।" বলেই কী মনে হল লছুয়ার, বলল, "বাবুরা ফিন আসবেন।"

"আবার আসবেন ? কবে ?"

“দো-তিন রোজ বাদ।”

ভিক্টর আর কথা বাড়াল না, নোটনকে ইশারায় বোঝাল, লছুয়াকে নিয়ে বাইরে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করতে।

লছুয়া চলে যেতেই ভিক্টর বলল, “শাসমলসাহেব, আমরা দেরি করলাম। আরও আগে এখানে আসা উচিত ছিল।”

শাসমল বললেন, “ডি· মিত্র লোকটা যে কে তা আমি জানি না, তবে পার্শিবাগানে মহাদেবের বাড়ি, সুনন্দনের বন্ধু।”

“ঠিকানাটা কি ঠিক?”

“বলতে পারছি না।”

“মহাদেব মোটরবাইক চড়ে?”

“এক্সপার্ট। খুব ভাল চালায়। আজকালকার ছেলেছোকরা মশাই, মোটরবাইক আর জিন্‌স্‌ হল ওদের প্রাণ।”

ভিক্টর একটু যেন হাসল। সে নিজেও তো আজকালকার ছোকরা।

শাসমল বললেন, “সমগ্র ব্যাপারটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে ঘোষসাহেব।”

ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে বলল, “মহাদেবকে আপনি আজকাল সুনন্দনের বাড়িতে দেখতে পান?”

“না। দিনকয়েক দেখিনি।”

“কত দিন?”

মনে-মনে হিসেব করে শাসমল বললেন, “সুনন্দনের অ্যাকসিডেন্টের পরও বার দুই নার্সিং হোমে গিয়েছিল। তারপর থেকে দেখছি না।”

“কী করে মহাদেব?”

“বাপের ফোটোগ্রাফির ব্যবসা ছিল। নাম করা কোম্পানি। বাবা মারা গেছেন। পৈতৃক ব্যবসাকে আরও ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তুলেছে মহাদেব। শুনেছি, সিনেমাওলাদের স্টিল ফোটোগ্রাফি থেকে শুরু করে এখন মুভি ক্যামেরার কাজকর্মও করার চেষ্টা করছে।”

“সুনন্দনের কেমন বন্ধু? ইন্‌টিমেট?”

“প্রাণের বন্ধু।”

“নীল বামনের ব্যাপারটা সে জানে? সুনন্দন যেন বলেছিল আমায়।”

“জানে।”

"প্যান্থার সার্কাসের চিঠিও সে দেখেছে?"

"দেখেছে বলেই জানি।"

ভিক্টর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। বলল, "আমার এখন আফসোস হচ্ছে শাসমলসাহেব। আরও দু-তিন দিন আগে এখানে এলে ভাল হত। ডায়েরি চুরি হয়েছে কলকাতায়, কিন্তু রহস্যটা বোধহয় এখানেই লুকিয়ে আছে।"

শাসমল বললেন, "কেমন রহস্য?"

ভিক্টর হাসল। কিছু বলল না।

নোটনরা চা আনল।

দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভিক্টররা। রাত্রের ট্রেন জার্নি, সকালের দিকে বাস আর ভানুবাবুর বদখত জিপের ঝাঁকানি, নতুন জায়গার কুয়োর জল, আলু ভাতে ভাত, ডাল, ডিমের কারি— সব মিলিয়েমিশিয়ে দুপুরে চমৎকার এক ঘুমের অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ওরই সঙ্গে সোনায় সোহাগা হয়ে দেখা দিল বৃষ্টি। পাহাড়তলির এই বৃষ্টি যেন আরও অলস ঘুমকাতুরে করে তুলল।

ঘুম ভাঙতে-ভাঙতে বিকেল।

নোটন এসে বলল, "দাদা, বিটবাবু কেশব ফিরে এসেছে।"

ভিক্টর বলল, "চল, দেখা করি। শাসমলসাহেব উঠবেন নাকি?"

শাসমল উঠে পড়েছিলেন। বললেন, "চলুন।"

এই কাঠের কুঠরির বিশ-পঁচিশ গজ দূরে, দুটি ঘর—, অল্প বারান্দা। বিটবাবু কেশব থাকে একটা ঘরে, অন্যটায় চৌকিদার লছুয়া।

কেশবের আজ ফিরতে দেরি হয়েছে। তার সাইকেলের টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। সাইকেল ঠেলে দু-তিন মাইল রাস্তা চক্কর মারা সোজা কথা নয় এখানে। তার ওপর বৃষ্টি।

কেশব সবে স্নান করে উঠেছে। গা-মাথা মুছে লুঙ্গি পরে হাজির হল কেশব। স্বাস্থ্য চমৎকার। মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। বছর বাত্রিশ বয়েস বড়জোর। মুখটি সাধারণ।

ততক্ষণে বারান্দার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে ভিক্টররা। বৃষ্টি নেই। মেঘ

ভেসে যাচ্ছে হুহু করে। বাদলা হাওয়া। বিটবাংলোর গায়ে একজোড়া ইউক্যালিপটাস। বাতাসে প্রায় নুয়ে পড়ছে। অন্য গাছগুলোর মধ্যে রয়েছে এক কাঁঠালগাছ আর ঘোড়ানিম। বাংলোর বেড়ার গা ধরে কাঁটাগাছ আর করবীঝোপ।

ভিক্টরই আলাপ শুরু করল। বলল, তারা দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছে এখানে। নিরিবিলিতে তিন-চারটে দিন কাটিয়ে ফিরে যাবে। অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে।

কেশব জানতে চাইল উদ্দেশ্যটা কী?

ভিক্টর আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। বলল, "আমার একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে। ওষুধের ব্যবসা। হোমিওপ্যাথি। বেলেঘাটায় নিজেদের ওষুধের কারখানা। নিজেদের কারখানায় ওষুধ তৈরি করি।"

শাসমল বোধ হয় বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। ভিক্টরসাহেব পাগলের মতন কী বলছেন। হোমিওপ্যাথি, ওষুধের ব্যবসা। শাসমল নিজে হোমিওপ্যাথির নাম শুনলে নাক কোঁচকান।

নোটন মজা পাচ্ছিল। দাদাকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ভিক্টর বলল, "আমাদের দেশে কতরকম গাছগাছড়া যে আছে, আর কত রকম তার গুণ। কবিরাজরাও জিনিসটাকে মডার্ন করতে পারল না। হোমিওপ্যাথি পেরেছে। আমাদের ফারমাকোপিয়াতে…" বলে ভিক্টর এমন মুরুব্বির ভঙ্গি করল যে মনে হল, বনের বিটবাবু কেশবকে সে এসব বড়-বড় কথা কী-বা বোঝাবে। কেশব যে জীবনেও ফারমাকোপিয়ার নাম শোনেনি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সামান্য থেমে ভিক্টর বলল, "আমরা শুনেছি, এই জায়গায় মানে এই এলাকাব বন-জঙ্গলে অটোমোটা রোবাটোস বলে— না না ওটা দেশী নাম নয়, বিদেশী নাম, দেশি নাম— ইয়ে মানে হিরুকণ্টক।"

শাসমল কোনওরকমে হাসি চেপে সামনে থেকে সরে গেলেন।

ভিক্টর বলল, "ওই গাছ একটু খুঁজে দেখব। চোখ আর লিভারের দারুণ ওষুধ। যদি গাছটা পাই…"

কেশব বলল, "এখানে নানারকম গাছপালা আছে। নামও জানি না।"

"খুঁজলেই যে পাব তা নয়— তবু দেখি। শুনেছি যখন।"

কেশব বলল, "দেখুন না।"

ভিক্টর কথা ঘুরিয়ে নিল, "লোকজন আসে এখানে ?"

"এমনি লোক ন'-ছ'মাসে একজন। আমাদের সাহেবরা আসেন।"

"ক'দিন আগে এক সিনেমা-পার্টির কারা যেন এসেছিল ? নামকরা লোক ?"

কেশব বলল, "দুজন এসেছিল। নাম বলতে পারব না।"

"জায়গাটা ভালই। তা ওরা কেমন দেখলটেখল ? মানে পছন্দ হল জায়গাটা ?"

কেশব মাথা নেড়ে বলল, "জানি না।"

"লছুয়া বলছিল, আবার আসবে বলে গিয়েছে !"

"আসতে পারেন। মহুয়া জঙ্গলের দিকে একটা টিলা আছে। টিলার তলায় পাহাড়ি নালা। ওপাশে বাবুরা ঘোরাফেরা করেছেন।"

ভিক্টর আর কিছু বলল না। কেশবকে অকারণে সন্দিগ্ধ করা উচিত নয়। সিনেমার বাবুরা সিনেমার লোক—তাদের সম্পর্কে বেশি উৎসাহ দেখালে কেশব অন্য কিছু ভাবতে পারে।

কেশবকে ছেড়ে দিয়ে ভিক্টর ইশারায় শাসমলকে ডাকল।

বিটবাংলোর সামনের দিকে পায়চারি করতে-করতে ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, আপনি কি ডায়েরির মধ্যে সেই ম্যাপটা দেখেছেন ?"

মাথা নাড়লেন শাসমল। বললেন, "আমাকে ডায়েরির কথা জিজ্ঞেস করবেন না। সুনন্দন হঠাৎ দেখলাম ডায়রিটা নিয়ে মেতে গিয়েছে, আমায় বলল, আমি এক-দু'বার দেখেছি। আমার কোনও আগ্রহ হয়নি। কী দেখেছি তাও আমার মনে নেই। জিনিসটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল এই পর্যন্ত। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।"

"কিন্তু আপনি বলেছেন, এমন ঘটনার কথা আপনি আগে বইয়ে পড়েছেন ?"

"পড়েছি। বিদেশের ঘটনা। ঘোষসাহেব, কত আজগুবি ঘটনার কথা আমরা বইয়ে-কাগজপত্রে পড়ি। অবাক হই। তা বলে মাথা ঘামাতে বসি না। বসে লাভ নেই।"

ভিক্টর বলল, "এই ব্যাপারটায় যে মাথা ঘামাতে হচ্ছে।" বলে একটু

হাসল। আবার বলল, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, মহুয়া জঙ্গলের যে টিলার কথা কেশব বলল, সেই জায়গাটায় সিনেমাওলারা অকারণে ঘোরাফেরা করেনি। যদি ওদের কাছে গানাসাহেবের ডায়েরির ছেঁড়া পাতাগুলো থাকে—তার মধ্যে ম্যাপটাও রয়েছে। ম্যাপ দেখেই ওরা টিলার কাছে ঘুরেছিল। আমরাও ওই দিকটা দেখব। কাল সকালেই বেরনো যাবে, কী বলেন?"

শাসমল হেসে বললেন, "যেমন হুকুম করবেন। হোমিওপ্যাথি ওষুধের গাছ খুঁজতে যাওয়া তো! কী যেন নাম বলছিলেন?"

নামটা নিজেই ভুলে গিয়েছিল ভিক্টর। মাথা চুলকোতে লাগল। হেসে উঠল।

কাঠের ক্রস

দুটো দিন বৃথাই কাটল।

মহুয়া জঙ্গলের কাছে টিলা আর তার একপাশে এক পাহাড়ি নালার মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়ার মতন কিছু নেই। পাহাড়তলির এই জায়গাটার যত্রতত্র টিলা। দূর থেকে সব সময় বোঝা যায় না। কাছে এলে ধরা যায়। সমতলভূমি বলতে এখানে কিছু নেই। আর গাছপালাও নানা ধরনের। বেশিরভাগই শাল মহুয়া আমলকী শিশু। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এক জায়গায় ইউক্যালিপটাস লাগানো হয়েছে। গাছগুলো যেন এখনও বাড় পায়নি।

পাহাড়ি নালা যেমন হয়, বর্ষায় বৃষ্টির জল পেলে ভরে ওঠে, উঁচু থেকে নেমে আসে জলের ধারা, আবার শুকিয়ে যায়—এখানকার অবস্থাও তাই।

কাছাকাছি অনেকগুলো টিলা খুঁটিয়ে দেখে ভিক্টর প্রায় হতাশ হয়ে গেল। কোনও দিক থেকেই ধরা যাচ্ছে না, কোন্ রহস্য আছে এখানে।

শাসমল বললেন, "কলকাতায় ফিরবেন নাকি?"

কথাটার মধ্যে ঠাট্টা ছিল। ভিক্টর ঠাট্টাটা হজম করে নিয়ে বলল, "দাঁড়ান, অধৈর্য হবেন না। আরও দুটো দিন দেখতে দিন।"

"আপনি ভাবছেন, মোটরবাইকওলারা আবার ফিরে আসবে?"

"ভাবছি না মশাই, চাইছি ওরা আবার একবার আসুক।"

"আসবে ?"

"যদি আশা না ছেড়ে দিয়ে থাকে আবার আসবে।...আচ্ছা শাসমল সাহেব, একটা কথা বলুন তো ? মোটরবাইকওলারা কি কলকাতা থেকে বাইক নিয়ে এসেছে না, এদিকে কোথাও থেকে জোগাড় করেছে ?"

শাসমল বললেন, "কলকাতা থেকে নিয়ে আসা ঝঞ্ঝাটের। এক যদি ট্রাকে চাপিয়ে কাছাকাছি কোথাও নিয়ে এসে থাকে ! না হয় কোনও রকমে এদিকেই কোথাও জুটিয়েছে।"

"ট্রাকে চাপিয়ে আনা যাবে ?"

"সহজেই। ট্রাকে টন-টন মালপত্র যায়, একটা সামান্য মোটরবাইক আনা যাবে না !"

ভিক্টর মাথা নাড়ল। শাসমল ঠিকই বলেছেন। রোড ট্রান্সপোর্টে বাইক আনা মোটেই কঠিন নয়। কাছাকাছি কোথাও থেকে জোটানো সম্ভব।

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ভিক্টর সিগারেট ধরাল। বলল, "নোটনকে তো লাগিয়ে দিয়েছি। লছুয়া আর কেশবের সঙ্গে নানা গল্প ফেঁদে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। আবার মাঝে-মাঝে বাইরের দিকেও টহল মেরে আসছে। নীল বামনের কথা লছুয়ারা জানে না, শাসমল সাহেব।"

শাসমল বললেন, "পুরনো ব্যাপার, সার। নীল বামন আর কি থাকবে !"

"ওরকম কিছু নেই তা হলে ?"

"না থাকারই কথা।"

"সুনন্দন তা হলে নীল বামন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন ?"

শাসমল বললেন, "আমি ঠিক বলতে পারব না। ও যে নিজে নীল বামনের কথা বিশ্বাস করে তাও আমার মনে হয় না। আর যদি-বা ধরুন নীল বামন আজও থেকে থাকে—তাদের ধরারও কোনও উপায় নেই। বন-জঙ্গলের পশুপাখি এখন আর ধরা যায় না।"

"সুনন্দন প্যান্থার সার্কাসকে চিঠিতে..."

"মামুলি চিঠি দিয়েছিল।"

সামান্য চুপ করে থেকে ভিক্টর বলল, "লছুয়া আর কেশব যা বলছে তাতে তো মশাই সন্দেহ হচ্ছে মহাদেবই এখানে এসেছিল। কী বলেন ?"

মোটরবাইক চড়ে যারা এসেছিল তাদের একজনের চেহারার বর্ণনা শুনে শাসমলের ওই রকমই ধারণা। ভিক্টর মহাদেবকে চেনে না। শাসমল চেনেন। তিনিই ভিক্টরকে বলেছেন কথাটা।

"মহাদেব বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় লোকটা কে?"

ভিক্টর চুপ করে থাকল।

আরও খানিকটা হেঁটে এসে ভিক্টর বলল, "আশেপাশে ছোট-ছোট বসতি আছে। দু'দশ ঘর লোকের বাস। চলুন, এবার ওদিকে একটু খোঁজ-খবর করা যাক।...আজ বিকেলে যাবেন?"

শাসমল বললেন, "আমার আপত্তি নেই। চলুন।"

গাছের মাথায় একঝাঁক পাখি ডাকাডাকি করছিল। ছায়ায়-ছায়ায় ভিক্টররা ফিরতে লাগল। আকাশ মেঘলা। গাছপালার ছায়া-ছড়ানো পায়ে চলা পথ। জঙ্গলের বাতাস বাদলার গন্ধে ভরা।

হাঁটতে-হাঁটতে ভিক্টর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী যেন দেখছিল।

শাসমলও দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভিক্টরের চোখ যেদিকে সেদিকে তাকালেন। কিছু বুঝতে পারলেন না।

"কী হল ঘোষসাহেব?" শাসমল বললেন।

ভিক্টর কোনও জবাব দিল না কথার। কয়েক পা এগিয়ে গেল। কুমড়োপাতার মতন একরকম পাতায় খানিকটা জায়গা ঝোপ হয়ে রয়েছে। আগাছার ঝোপ। হাত কয়েক দূরে বিরাট তেঁতুলগাছ। পিচফলের মতন কিছু ফল ধরে আছে একটা গাছে। ফলগুলো দেখতে অবশ্য ছোট।

পিঠ নুইয়ে ভিক্টর কী একটা দেখতে দেখতে শাসমলকে ডাকল।

কাছে এলেন শাসমল।

"ওটা চিনতে পারেন?" ভিক্টর আঙুল দিয়ে জিনিসটা দেখাল।

শাসমল দেখলেন। বললেন, "মনে হচ্ছে ক্রস।"

"হ্যাঁ। এখানে ক্রস কেন?"

শাসমল একটু ভেবে বললেন, "আদিবাসীরা থাকত এদিকে। ওদের মধ্যে অনেকে ক্রিশ্চান হয়েছিল। হয়তো এই জায়গায় কাউকে কবর দেওয়া হয়েছে।"

ভিক্টর আরও দু'পা এগিয়ে গেল। তার কাঁধের ছোট ঝোলায় সামান্য কয়েকটা দরকারি জিনিস আছে। খুরপি, ছুরি, মাটি-খোঁড়া কাঁটা। এমনকি কয়েক গজ নাইলনের দড়ি। টুকিটাকি আরও কিছু।

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে ভিক্টর ছুরিটা বার করে নিল।

শাসমলের কাঁধে জলের ফ্লাস্ক। ফ্লাস্ক নামিয়ে শাসমল বললেন, "করবেন কী?"

ভিক্টর কোনও জবাব দিল না কথার। আগাছাগুলো কাটতে লাগল।

ফ্লাস্কের ঢাকনি খুলে শাসমল খানিকটা জল খেলেন।

ক্রস একপাশে হেলে রয়েছে। কাঠের ক্রস।

ভিক্টর হাঁটু গেড়ে বসে ক্রসটা দেখতে লাগল।

"আপনি দেখুন," ভিক্টর বলল।

শাসমল মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলেন। দেখলেন ঝুঁকে পড়ে। বললেন, "ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে কাঠের ওপর নাম খোদাই করে রেখেছে। কী কাঠ মশাই?"

"পড়তে পারেন?"

"পারছি না। ময়লা ধরে গিয়েছে।"

"রোদ বৃষ্টি জল ঝড়, গাছপালা—ময়লা তো ধরবেই। তবু কিছুই পড়তে পারছেন না?"

শাসমল আরও ঝুঁকে পড়লেন। আগাছার পাতা দিয়ে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন লেখাগুলো। বললেন, "ইংরিজি হরফ।"

"রোমান হরফ।"

"তলার একটা লেখা কিছু পড়তে পারছি।"

"প্রথমটা নেই। পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে জায়গাটা।"

"হ্যাঁ। ডবলুর মতন একটা অক্ষর দেখছি।"

"'ও' হরফও রয়েছে মনে হচ্ছে।"

"মানেটা কী? ও ডবলু?"

ভিক্টর যেন তামাশার গলায় বলল, "পি ও ডবলু নয়তো? প্রিজনার অব ওয়ার। মানে যুদ্ধবন্দী।"

"যুদ্ধবন্দী?" শাসমল অবাক।

ভিক্টর বলল, "অন্য মানেও হতে পারে। 'পি' এখনও খুঁজে পাইনি।....আপনি সরুন। ওপরের কাঠটা আমি খুলে নিয়ে যাব।"

শাসমল সরে এলেন।

ভিক্টর বসে পড়ল মাটিতে। ঝোলা থেকে যন্ত্রপাতি বার করল। কাঠটা প্রায় পচে গিয়েছিল। খোলার আগেই ভেঙে গেল।

ভিক্টর উঠে পড়ল কাঠের টুকরো হাতে। বলল, "চলুন, ফিরে গিয়ে এটা পরিষ্কার করি। দেখা যাক কার নাম লেখা আছে?"

শাসমল বললেন, "চলুন। কিন্তু ভিক্টরসাহেব, এই কাঠের টুকরোর সঙ্গে নীল বামনের সম্পর্ক কী?"

ভিক্টর বলল, "হয়তো কিছুই নয়। তবু একটা কথা আছে জানেন তো? যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো ভাই, পাইলেও পাইতে পার..." বলে হাসল ভিক্টর, কথাটা শেষ করল না।

শাসমল বললেন, "অমূল্য রতন পাবেন! দেখুন।"

কাঠের সরু ফলকটা নিয়ে ভিক্টর এত রকম গবেষণা শুরু করল যে শাসমল মজা পেয়ে বললেন, "আপনি কি শিলালিপি উদ্ধার করছেন ভিক্টরসাহেব?"

শিলালিপি না হোক ওই ময়লা দাগধরা পচে যাওয়া কাঠের ফলক থেকে খোদাই করা নামটা উদ্ধার করতে ভিক্টরের বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যতদূর বোঝা গেল, নামটা কার্লো পিরো নামের কোনও ভদ্রলোকের হতে পারে। মারা যাবার পর তাঁর কবর হয়েছে ঢালপাহাড়ির কাছে বনে-জঙ্গলে।

ভিক্টর একসময় খেলাধুলো নিয়ে মাতামাতি করেছে অনেক। সে ছিল কলেজ টিমের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন। ফুটবলে সুবিধে করতে না পারলেও বাইরের বড়-বড় খেলোয়াড়দের নামধাম জানত। কার্লো পিরো নাম থেকে তার মনে হল, ইটালিয়ান নাম। অবশ্য নামটা যদি ঠিকমতন উদ্ধার করা হয়ে থাকে।

কার্লো মানুষটা ইটালির, কিন্তু তার কবর এরকম অদ্ভুত জায়গায় হল কেন?

নোটনের ঘাড়ে ভিক্টর একটা কাজ চাপিয়েছিল। বলেছিল, আমাদের সঙ্গে তুই জঙ্গলে ঘুরবি তো ঘোর। কিন্তু তোর অন্য কাজ হল আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো। দেখবি, ছোট-ছোট যে বসতি আছে, দু-দশটা গেঁয়ো কুঁড়ে, এসব জায়গায় ঘুরে বেড়াবি। গল্পগুজব জমাবি। খবর নেবার চেষ্টা করবি—এই জায়গায় কারা আসে, এখানে আগে কেমন অবস্থা ছিল, কারও নজরে অদ্ভুত কিছু পড়েছে কি না!

নোটন দিন-দুই ধরে এই কাজটাই করে বেড়াচ্ছিল সকালের দিকে।

নোটনের কাছ থেকে জানা গেল, মাইলখানেক তফাতে একটা গ্রাম আছে। ছ'-সাতটি মাত্র কুঁড়ে ঘর। ওরা বলে 'কুঁড়িয়া'। কাঠুরে গাঁ। ওই গ্রামের এক বুড়োর সঙ্গে নোটন দিব্যি খাতির জমিয়ে নিয়েছে। লোকটা একসময় পল্টনে কাজ করেছে। মিলিটারি মেসে খানসামার কাজ।

ভিক্টর বলল, "আজ বিকেলে যাব বুড়োর কাছে। কী বলুন শাসমলসাহেব?"

শাসমল হেসে বললেন, "আমি আপনার হুকুমে হাজির আছি। যা বলবেন সার! তবে বিকেলে বৃষ্টি আসতে পারে জোরে।"

বৃষ্টি এল না। ধোঁয়াটে হালকা মেঘ ভাসতে-ভাসতে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে জমা হতে লাগল যেন। ওপাশটা অনেক কালচে দেখাচ্ছিল।

নোটন মাইলখানেক পথ হাঁটিয়ে যেখানে নিয়ে এল সেটা আদিবাসীদের ছোট গ্রাম বলেই মনে হয়। কয়েক ঘর মাত্র বসতি। মাটির কুঁড়ে। মাথার ওপর খাপরা আর পাতার ছাউনি। কাঠকুটোও চাপানো আছে। গোটাদুয়েক ছাগল আর চার-ছ'টা মুরগি চরছে সামনে। টুকরো টুকরো হাত কয়েকের খেত। কোথাও শাকপাতা, কুমড়ো-লাউ, কোথাও বা কচি ঢেঁড়শ ফলেছে।

বুড়ো বাইরেই ছিল। নোটনকে দেখে এগিয়ে এল।

বয়েস হয়েছে বুড়োর। ষাটের ওপর। মাথায় চুল নেই, প্রায় নেড়ার মতন দেখায়। কপাল গালের চামড়া কুঁচকে রয়েছে। গলায় একটা ক্রস ঝুলছে ওর। ময়লা খাটো ধুতি। ধুতি আর গায়ের গেঞ্জি দুই-ই ছেঁড়া।

বুড়োর নাম মুংরু। নামের আগে পরে একটা লেজুড় জুড়েছে। বলে

বার্জ। কেন কে জানে!

ভিক্টররা মুংরুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলল। সিগারেট দিল।

মুঠো পাকিয়ে সিগারেট ধরে বড়-বড় টান মারল মুংরু। তারপর নিজের কাহিনী শুরু করল। কথা বলতে ভালবাসে লোকটা।

মুংরুর কাহিনী থেকে বোঝা গেল, গত যুদ্ধের সময়, মুংরুর বয়েস যখন কুড়িও হয়নি তখন সে মিলিটারি ক্যাম্পে ঝাড়ুদারের কাজ করত। ওই যে পাহাড়ি টিলা ওখানে ক্যাম্প বসেছিল একটা। তারকাঁটায় ঘেরা ছিল অনেকটা জায়গা। পঁচিশ-ত্রিশজন সাহেব থাকত। কারও হাতকাটা, কারও পা কাটা। ডাক্তার ছিল ক্যাম্পে। মিলিটারি ট্রাকে করে খাবারদাবার ওষুধ আসত। ওটা ঠিক হাসপাতাল ছিল না, মিলিটারি হাসপাতাল থেকে আসত সাহেবরা। দু-চার মাস পরে তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। কোথায় যে মুংরু জানে না। তবে, ওদের খুব তোয়াজে রাখা হত।

একদিন ক্যাম্পে কী যে হল কে জানে, বোমা পড়ার মতন শব্দ হল বিকট। আগুন ধরে গেল। তছনছ হয়ে গেল ক্যাম্প। দু-পাঁচজন বাঁচল, বাকি সব মারা গেল। মিলিটারি অ্যাম্বুলেন্স এসে হটিয়ে নিয়ে গেল সকলকে।

মুংরু চলে গেল অন্য ক্যাম্পে। দূরে। সেখানে তাকে ঝাড়ুদারের কাজও করতে হত, আবার খানসামার কাজও।

যুদ্ধ থেমে যাবার পর মুংরু রেল খালাসির কাজ করেছে। শেষে সে আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়। তবে এই জায়গায় নয়, ক্রোশখানেক দূরে। তাদের গাঁ তখন হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। সাদা মাটি খুঁড়ছে বাবুরা। তারা এই জায়গাটায় এসে উঠল।

ভিক্টর মন দিয়ে সব শুনল। শেষে বলল, "এই টিলায় পরে আর কেউ আসত না?"

মুংরু বলল, সে ঠিক জানে না। তবে দু-তিনজন সাহেব এসেছিল এখানে।

"পাদরিসাহেব?"

মুংরু মাথা নাড়ল। না। তবে এক পাদরিসাহেবকে পরে দেখেছে। চেনা-জানা হয়নি।

ভিক্টর বলল, "কত দিন আগে দু-তিনজন সাহেব এসেছিল ?"

মুংরুর হিসেবের মাথা নেই। যা বলল—তার থেকে মনে হল, বছর দশ-বারো আগে। তারা তাঁবু গেড়ে থাকত, জিপ গাড়ি ছিল, যন্ত্রপাতি সঙ্গে এনেছিল। এক সাহেব মারা গেল। বাকিরা ফিরে গেল।

এখানে ওই টিলায় কোনও অদ্ভুত কিছু লোকজন দেখা যায় কি না মুংরু বলতে পারল না।

ভিক্টররা আর দেরি করল না। আকাশের চেহারা ঘোর হয়ে আসছিল।

ফেরার পথে শাসমল বললেন, "কী মনে হচ্ছে ভিক্টরসাহেব ?"

ভিক্টর বলল, "আমার খটকা লেগেছিল প্রথমে। ভাবছিলাম ওখানে যুদ্ধের সময় কোনও 'প্রিজনার অব ওয়র' ক্যাম্প ছিল কি না! শুনেছি ব্রিটিশরা এদেশে গত যুদ্ধের শেষের দিকে যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্প বসিয়েছিল, কয়েকটা জায়গায়।"

"আপনার কার্লো... ?"

"ইটালিয়ান। হতে পারে আফ্রিকা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা হোমরাচোমরা কয়েকজন ইটালিয়ানকে ধরতে পেরেছিল।"

"জার্মানরা না যুদ্ধ করত আফ্রিকায় ? রোমেলের দল ?"

"মুসোলিনীর সৈন্যসামন্ত বোধহয় কোথাও কোথাও লেজুড় হয়ে থাকত।" ভিক্টর সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "তা প্রিজনার অব ওয়র নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ওটা যুদ্ধবন্দী ক্যাম্প ছিল না। ছিল রেস্ট ক্যাম্প। যুদ্ধের সময় যেসব ব্রিটিশ অফিসাররা জোর ঘায়েল হত তাদের কারও কারও আরোগ্য শিবির। মুংরুর কথা থেকে তাই আন্দাজ হয়।"

শাসমল বললেন, "আচ্ছা! কিন্তু ক্যাম্পে ঘটেছিল কী ? বোমা পড়ার মতন শব্দ, আগুন, ক্যাম্প ছারখার হয়ে গেল ?"

ভিক্টর বলল, "কে জানে! কোনও প্লেন ভেঙে পড়তে পারে। হয়তো বোম্বার।"

"বোমারু উড়োজাহাজ ?" শাসমল ঠাট্টার গলায় বললেন। "কাণ্ড দেখুন ভিক্টরসাহেব, নিজেদের বোমায় নিজেরাই ঘায়েল ?"

"অ্যাকসিডেন্ট !"

"অন্য কিছু নয় তো ?"

"অন্য কী ?"

"মানে বাইরে থেকে কিছু এসে পড়েনি তো ?"

"বাইরে থেকে কী এসে পড়তে পারে ?" বলেই ভিক্টরের যেন খেয়াল হল, উল্কাটুল্কা ছিটকে এসে পড়েনি তো ? খানিকটা যেন চমকে উঠল ভিক্টর। উল্কাপাত হতেই পারে। কেউ বলতে পারে না, কেন কবে কোথায় একটা উল্কা এসে ছিটকে পড়বে পৃথিবীর মাটিতে !

হাঁটতে হাঁটতে দশ-পনেরো গজ এগিয়ে এসে ভিক্টর হঠাৎ বলল, "আপনি অন্ধকারে ঢিলটা ভালই ছুঁড়েছেন। বস্তুটা উল্কা হতে পারে।"

"উল্কাবৃষ্টি ?"

"বৃষ্টি হোক আর না হোক একটা উল্কাপাত হতেই পারে।...আর মনে হচ্ছে, ওই ঘটনার অনেক পরে তিন সাহেব এসেছিল ব্যাপারটা সরজমিনে দেখতে। বোধহয় ওরা ছিল বিজ্ঞানী। তাঁবু গেড়ে বসে পড়েছিল চারপাশ পরীক্ষা করতে। ওদের মধ্যে একজন কার্লো পিরো। কার্লো বেচারি মারা যায়। তারই কবর পড়েছে ওখানে।"

শাসমল বললেন, "এর সঙ্গেই বা নীল বামনের সম্পর্ক কী ?"

"কিছু নয়। তবে..."

ভিক্টরের কথা শেষ হল না। নোটন বলল, "দাদা মোটরবাইকের শব্দ।"

বাইক দেখা যাচ্ছিল না। শব্দটা শোনা যাচ্ছিল।

মহাদেব

মোটরবাইকটা কাছাকাছি আসতেই ভিক্টররা পাথরের আড়ালে সরে গিয়েছিল।

পাহাড়ি চড়াই পথ। পায়ে হাঁটার মতন চওড়া। এ-পথে জিপ নিয়ে ওঠা যায় না। জিপের একটা রাস্তা অবশ্য আছে কিন্তু ঘুরপথে। সরকারি অফিসাররা বিটবাংলোয় যাবার সময় সেই রাস্তা ধরেই যায়।

ভিক্টররা আড়াল থেকে দেখল, মোটরবাইকেব চেহারাটা বেশ

জাঁদরেল। হালকা ফিনফিনে যে-ধরনের বাইক আজকাল বেরিয়েছে বাজারে, সেরকম নয়। পুরনো ধরনের। রং কালো। যারা বসে আছে তাদের মাথায় হেলমেট। গায়ে 'উইণ্ড চিটার।' বাতাস এবং বৃষ্টি দুই-ই আটকানো যায়। পরনে জিনস-এর প্যান্ট। বাইকের এপাশে-ওপাশে লটবহর ঝোলানো রয়েছে।

বাইকটা ধীরে-ধীরেই এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

গজ-তিরিশ-চল্লিশ এগিয়ে বাঁক নিল বাইকটা। গাছপালার আড়ালে চলে গেল।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ভিক্টররা।

ভিক্টরকে কিছু বলতে হল না। শাসমল নিজেই অবাক হয়ে বললেন, "মহাদেব।"

ভিক্টর বলল, "চিনতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ, মহাদেব। তবে মোটরবাইকটা ওর নয়। ওর নিজের বাইকের রং লাল। পুলিশ সার্জেন্টদের মতন।"

"কাছাকাছি কোথাও থেকে জোগাড় করেছে।"

"হ্যাঁ, তাই দেখছি।"

"পেছনের লোকটাকে চিনতে পারলেন?"

"না।"

নোটন বলল, "ওরা বিটবাড়ির দিকে যাচ্ছে।"

মোটরবাইকটা যে এই সরু পায়ে-চলা পথ ধরে বিটবাংলোর দিকে যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

ভিক্টর হালকা গলায় বলল, "যাচ্ছে, আবার ফিরে আসবে।"

"ফিরে আসবে?"

"বিটবাংলোয় গিয়ে যখন দেখবে থাকার জায়গা নেই, ঘর দখল হয়ে গিয়েছে তখন আর কী করবে!" ভিক্টর যেন মজা পাচ্ছিল।

শাসমল বললেন, "করবে আর কী! চাপরাশির কাছ থেকে খাতা চেয়ে নিয়ে দেখবে, কারা ঘর দখল করল। খাতায় নাম দেখবে বলাই শাসমল অ্যাণ্ড পার্টি। ব্যস, তারপর আর বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না!"

ভিক্টর হেসে বলল, "দ্যাটস্ রাইট। শাসমলসাহেব, আপনি লিটল জু

ছেড়ে আমার অফিসে এসে বসুন।"

শাসমলও হাসলেন। বললেন, "তাই দেখছি।"

নোটন হঠাৎ বলল, "দাদা, খেলা জমে গেল। এইবার সেই নাগাপাহাড়ে রক্তারক্তির মতন ব্যাপার হবে।"

ভিক্টর জোরে হেসে উঠল। এক টাকা দু' টাকা সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে-পড়ে নোটনের মাথায় সব সময় রক্তারক্তির রোমাঞ্চ।

তবে, কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেনি নোটন। মহাদেবরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে। এসে যদি দেখে বলাই শাসমলও বিনি উদ্দেশ্যে ঢালপাহাড়ি আসেননি তারা তো ছেড়ে দেবে না। খুনোখুনি হতেও পারে।

ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, নোটন কী বলছে শুনলেন?"

শাসমল বললেন, "শুনলাম।"

"এবার কী হবে বলতে পারেন?"

"সব পারি না। প্রথমটা পারি। আমরা এখানে এসেছি দেখে মহাদেবরা অবাক হবে। ওরা এখনকার মতন সরে পড়বে। কিন্তু বরাবরের মতন নয়।"

"ঠিক বলেছেন।"

"আরও একটা কথা ভিক্টরসাহেব! আমরা এখন থেকে বিপদের মধ্যে পড়লাম। ওরা নজর রাখবে।"

"আমরাও আসব।"

"কিন্তু কেন?...আমি এখনও বুঝতে পারছি না—আমরা কেন এখানে এসেছি? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কী ঘটেছিল তা জানতে তো আমরা আসিনি।"

ভিক্টর বলল, "না, সেটা জানতে আসিনি। আমরা উল্কা-বিশারদ নই। প্লেন বা বোম্বার-বিশারদও নয়। তবে, এটা আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই পুরনো ঘটনার সঙ্গে কার্লোসাহেবদের ঢালপাহাড়িতে আসা। আর তারপর গানাসাহেবের নীল বামন দেখার একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।"

ভিক্টররা হাঁটতে লাগল। মোটবাইকের শব্দ এই পাহাড়তলিতে অনেকক্ষণ শোনা গিয়েছিল। ফিকে শব্দ মিলিয়ে এল শেষ পর্যন্ত।

সিগারেট ধরাল ভিক্টর। অন্যমনস্ক। বলল, "আপনারা বলছেন

ডায়েরিতে নীল বামনের কথা লেখা ছিল। ডায়েরির ওই পাতাগুলো আমি দেখিনি। সুযোগ হয়নি। কিন্তু আপনাদের কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছে, গানাসাহেব ঠিক নীল বামন বলে কিছু লেখেননি। বামনের মতন দেখতে লিখেছেন। মানে, শর্ট হাইট। বেঁটে। বেঁটে বামন বলে একটা কথা আমরা বলি। তার মানে বামন নয়, এত বেঁটে যে বামনের মতো দেখায়।"

শাসমল হেসে বললেন, "তালগাছের মতন লম্বা বললে যেমন সত্যি-সত্যি মানুষ লম্বায় তালগাছ হয় না।"

"ঠিক বলেছেন।"

"তা বামনই হোক আর বেঁটেই হোক—তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক আগের ঘটনাগুলোর ?"

"সেটাই তো রহস্য, মশাই। আমরা এসেছি রহস্য উদ্ধার করতে। দেখি কতটা পারি।"

চড়াই আর চড়াই। মাঝে-মাঝে বাঁক। পাথর, ঝোপঝাড়, গাছপালা। আকাশ এবার কালো হয়ে আসছে।

আরও খানিকটা হেঁটে এসে ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, আমি যেন কোথায় পড়েছিলাম, আকাশ বা শূন্য থেকে যেসব উল্কাটুল্কা পড়ে তার ওপর গবেষণাও করা হয়। আজকাল গবেষণার যুগ।"

"তা ঠিকই।"

"লেখাপড়া এখন চুলোয় দিয়েছি। তবু আমার মনে হচ্ছে, আমেরিকায় অ্যারিজোনায়—উইন্‌ কি যেন উইন্‌সলো কি নামটা—একটা উল্কা পড়েছিল দশ হাজার বছর আগে। যে জায়গায় পড়েছিল সেখানে নাকি মাটি ফেটে বিরাট এক দিঘির মতন হয়ে গিয়েছে। সাড়ে তিনশো-চারশো হাত গর্ত।"

শাসমল বললেন, "উল্কা তো সোনা নয় ভিক্টরসাহেব, যে, সোনার জন্যে লোকে ছুটবে !"

"এখানেই তো ভুল করলেন। অনেকের কাছে সোনা যত দামি, এক টুকরো উল্কার দাম তার চেয়ে কম নাও হতে পারে।"

"পাগলের কাণ্ড।"

নোটন হঠাৎ বলল, "দাদা, ওই দেখুন..."

ভিক্টররা বিটবাংলোর কাছাকাছি চলে এসেছিল। এখান থেকে বাংলো দেখা যায়। ওরা নীচে, বাংলোটা ওপরে, টিলার মাথায়। নোটনের কথায় ওরা বাংলোর দিকে তাকাল। মহাদেবদের দেখা যাচ্ছে। মোটরবাইক দাঁড় করানো।

শাসমল বললেন, "ওরা এখন কী করবে ? ফিরে আসবে। এই রাস্তা দিয়েই। এখানে কোনও পাথর নেই যে আমরা আড়ালে গিয়ে লুকবো !"

ভিক্টর বলল, "ঝোপ আছে, বালিয়াড়ির মতন এবড়োখেবড়ো জমি আছে। আমরা সেরেফ ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ব।"

শাসমল চারদিকটা একবার দেখে নিলেন, যেন লুকোবার জায়গা খুঁজলেন।

নোটন বলল, "দাদা, আমরা এগিয়ে যাব ? না, এখানেই হল্ট মেরে যাব ?"

"আরও একটু এগিয়ে চলো। তারপর হল্ট..."

বিটবাংলোর দিকে চোখ রেখে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে ভিক্টররা দাঁড়াল।

বাংলোর সামনেটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লছুয়া দাঁড়িয়ে আছে। মহাদেবরা যেন অস্থির। পায়চারি করছে।

শাসমল বললেন, "ওই ছোকরা মহাদেব। খুব হাত-পা নাড়ছে। দেখতে পাচ্ছেন ? ওই যে, লম্বা মতন।"

ভিক্টর বলল, "অন্য লোকটা কি চৌধুরী ?"

"চৌধুরী ?"

"হাসপাতালের চৌধুরী !"

"আচ্ছা ! কেমন করে বুঝলেন ?"

"আন্দাজে বললাম, চৌধুরী নাও হতে পারে।"

ভিক্টররা আর এগিয়ে গেল না। মহাদেবরা যেন হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচামেচি করছিল লছুয়ার সঙ্গে। করতে করতে মোটরবাইকের সামনে ফিরে এল।

ভিক্টর বলল, "মিলিটারি কায়দায় ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ুন ! ওরা

আসছে ।"

মোটরবাইকের শব্দ শোনা গেল । গর্জন করে উঠল যেন যন্ত্রটা । যতটা প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি গর্জন করছিল । মহাদেবদের রাগ-বিরক্তি প্রকাশের জন্যেই বোধহয় ।

গাড়ি নেমে আসছে ।

ভিক্টররা লুকিয়ে পড়ল ।

সামান্য পরেই বাইক সামনে এসে পড়ল । হাত-দশেক তফাত মাত্র । মোটরবাইকটা ঢালু পথ বেয়ে সাবধানে নীচে নেমে গেল ।

ওরা আড়ালে যেতেই ভিক্টররা উঠে পড়ল ।

জামা-প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে শাসমল বললেন, "ওরা কী বলছিল শুনতে পেয়েছেন ?"

"না ।"

"গাড়ির শব্দে আমিও শুনতে পেলাম না। তবে মনে হল, গালমন্দ করছে আমাদের ।"

ভিক্টর বলল, "চলুন, লছুয়াদের কাছেই শুনতে পাব ।"

বিটবাংলোয় ফিরে লছুয়ার মুখে যে বৃত্তান্ত শুনল ভিক্টররা তাতে বুঝতে পারল, মহাদেবরা যত না খেপেছে তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছে ।

"সাহেবরা এত গোসা করলেন, বাপ রে বাপ ।" লছুয়া বলল, "মাগর আমি কী করব ! ঘর ফাঁকা আছে, দুসরা লোক এসেছে । আমি সরকারকা নোকর । আমার ডিউটি আমি করেছি । ঘর ফাঁকা রাখব, দুসরা সাহেবরা ফিরে যাবে ! তামাশা !"

কেশব বলল, "বাবুরা মাথা গরম করলেন ।"

লছুয়া বলল, "ডর ভি লেগে গেল । ভটভটিয়াবাবু দোসরা বাবুকো বললেন, কী বাত বললেন কেশববাবু ?"

কেশব বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বললেন ।"

শাসমল বললেন, "তুমি তোমার খাতা দেখিয়েছ লছুয়া ?"

"কী ।....খাতা দেখে চক্কর লেগে গেল ।"

"ঠিক আছে । চক্কর লাগুক । তোমরা আইন মতন কাজ করেছ ।

আমরাও বেআইনি কাজ করিনি। ওরা আবার আসবে বললে ?”

কেশব বলল, “কিছু বললেন না।”

“ভেগে গেলেন,” লছুয়া বলল।

ভিক্টর বলল, “ঠিক আছে। এখন তুমি আমাদের চা খাওয়াও লছুয়া।”

লছুয়ারা চলে গেল।

বাংলোর বাইরে বিকেল পড়ে ধীরে-ধীরে ঘোলাটে ছায়া নেমে যাচ্ছিল। আকাশ ক্রমশই কালো হচ্ছে পাহাড়ের দিকে। এপাশেও মেঘের কালো ছড়িয়ে এল।

ভিক্টর বলল, “শাসমলসাহেব, কাল কি পরশুই আমাদের ফাইনাল অ্যাসাল্ট। হয় জিতলাম, না হয় হারলাম।”

“কালকের পর পরশু কে থাকবে ! পেটে গামছা বেঁধে থাকব নাকি ? ফুডস্টক কাল শেষ।”

নোটন বলল, “আমি চাল-ডাল এনে দেব ?”

“কেমন করে ?”

“কেশবের সাইকেল নিয়ে বাসমোড় চলে যাব।”

ভিক্টর মোটেই পেটের চিন্তা করছিল না। অন্য কথা ভাবছিল। মহাদেবরা ফিরে যাবার লোক নয়। তারা আবার আসবে। তবে বিটবাংলোয় নয়। ওই মহুয়া জঙ্গলের কাছে বা পাশাপাশি কোথাও। ঘুরে বেড়াবে। কেন বেড়াবে—সেটাও বোঝা যায়। গানাসাহেবের হাতে আঁকা ম্যাপ ওদের কাছে। ম্যাপে দেখানো জায়গাটা ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজবে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্যটাও বোঝা যায়। ওরা ঠিক জায়গায় যদি হাতড়াতে পারে—তা হলে নিশ্চয় মহামূল্য কিছু পাবে।

কিন্তু, ভিক্টর বুঝতে পারছিল না, এই মহাদেবরা ক'দিন আগেই এখানে এসেছিল। ম্যাপটাও তাদের সঙ্গে ছিল। তারা ছবি তোলার নাম করে বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঘোরাফেরা খোঁজাখুঁজি করেছে কোনও কিছু প্রাপ্তির আশায়। তখন যদি তারা ব্যর্থ হয়ে থাকে তা হলে কেমন করে ভাবছে এবার সফল হবে ?

মহাদেবরা কি তা হলে প্রথম বার বেজায়গায় ঘোরাফেরা করেছিল ? বিফল হয়ে ফিরে গিয়ে আবার এসেছে সঠিক জায়গার সন্ধান নিয়ে ? তা

যদি হয়, তবে বলতে হবে, এমন কেউ আড়ালে আছে যে মহাদেবদের সঠিক জায়গার হদিস দিতে পেরেছে। সে কে? আর কেনই-বা গানাসাহেবের ম্যাপ দেখে মহাদেবরা সঠিক জায়গাটা বুঝল না?

পেনসিলে আঁকা খসড়া ম্যাপ দেখে এই বন-জঙ্গলে জায়গা খুঁজে বার করা কঠিন। জঙ্গল বড় তাড়াতাড়ি পালটে যায়। গাছপালা বাড়ে, লতাপাতা ছড়ায়, ঝোপঝাড় মাটি পথ ঢেকে দেয়। গানাসাহেবের দেখানো জায়গা এত বছর পরে ঠাওর করা কঠিন, খুবই কঠিন।

ভিক্টরের ধারণা, মহাদেবরা ভুল শুধরে নতুন করে জায়গাটা খুঁজতে এসেছে। এই ভুল শুধরে দেবার মতন কেউ কি রয়েছে আড়ালে?

না হয় মহাদেবরা নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে পেয়েও কোনও কারণে কাজে হাত দিতে পারেনি। এবার এসেছে পুরোপুরি তৈরি হয়ে।

ভিক্টর অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর শাসমলকে বলল, "কাল থেকে আমাদের অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্তন। মহাদেবরা যে-কোনওভাবে যে-কোনও পথ দিয়ে জঙ্গলে আসবে। ওরা কোথায় আসছে, কী করছে—নজর রাখতে হবে আমাদের। হয়তো মুখোমুখিও হতে হবে ওদের। আপনি কোনও অস্ত্রটস্ত্র এনেছেন?"

শাসমল মাথা চুলকে বললেন, "ওই ড্যাগার। যা আমি ছুঁড়তে জানি। কিন্তু প্র্যাকটিস নেই। ভুল জায়গায় গেঁথে যেতে পারে।"

নোটন বলল, "দাদা, আমাদের সব রেডি আছে।" বলে হাসল।

চোরের ওপর বাটপাড়ি

পরের দিন ভিক্টররা নজরদারি করেও মহাদেবদের কোনও হদিস পেল না। জঙ্গলের সর্বত্র সমান হয় না। কোথাও গাছপালা ঘন। এত ঘন যে, দশ হাত দূরেও কী আছে দেখা বা বোঝা যায় না। আবার কোথাও-কোথাও গাছের ঘনত্ব নেই। অল্প গাছ, ঝোপঝাড় বেশি, চারপাশে তাকালে অনেক কিছুই নজরে পড়ে। কোথাও বা নিতান্তই কাঁটাগাছ আর নুড়ি পাথর ছাড়া অন্য দৃশ্য চোখেই পড়ে না।

ভিক্টররা তৈরি হয়েই নজরদারিতে বেরিয়েছিল।

শাসমল বললেন, "আর একটা দূরবিন আনতে পারলে ভাল হত।

তখন কি ছাই জানতাম এখানে এসে নজরদারি করতে হবে।"

ভিক্টর হেসে বলল, "আপনি কি ভেবেছিলেন জঙ্গলে আমরা হারমোনিয়াম বাজাতে আসছি ? ঢাল-তলোয়ার ছাড়া যুদ্ধ হয় ?"

শাসমল বললেন, "আপনার ঢাল বলতে ওই দূরবিন ; আর তলোয়ার বলতে ওই পিকিউলিয়ার ব্যাটন।"

ভিক্টর তামাশা করে বলল,"এই যথেষ্ট। পিস্তল আমি ব্যবহার করি না, যদিও তাতে আমার হাত একেবারে মন্দ নয়।" বলে নোটনকে দেখাল। বলল, "নোটনের কাছে আছে ওর 'চিতি'। দেখতে পাতলা ফিনফিনে ছুরি— কিন্তু চিতিসাপের চেয়ে ভয়ঙ্কর।"

নোটন বলল, "আমার হাতিয়া।" বলে কোমরে গোঁজা হাত-খানেকের গোল লাঠিটা দেখাল। লোহার রিং লাগানো লাঠিটায়। ওটা যেন একটা রুলের মতনই দেখতে।

শাসমল বললেন, "ধরুন ওদের সঙ্গে রিভলভার আছে।"

"থাকতে পারে।"

"তখন ?"

"তখনকার কথা তখন। আপনি আমাদের অবজ্ঞা করবেন না শাসমলসাহেব। আমরা রিভলভারে ডরাই না।"

"বেশ করেন। এদিকে তো দুপুর গেল। এরপর ?"

"বিকেল পর্যন্ত দেখব। তারপর ফিরে যাব।"

"রাত্তিরে ?" শাসমল ঠাট্টা করে বললেন।

"রাত্তিরে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। মহাদেবরা অতটা সাহস করবে বলে মনে হয় না।" বলে ভিক্টর একটু চুপ করে থেকে বলল, "অন্ধকারে ছুঁচ খোঁজার চেয়েও ঘুটঘুটে অন্ধকারে জঙ্গলে কিছু খোঁজা বড় কঠিন। মহাদেবরা এখানে বাঘ শিকার করতে আসেনি, এসেছে মহামূল্য কিছু খুঁজতে !"

শাসমল আর কিছু বললেন না।

সারাটা দিন জঙ্গলে ঘুরে ফিরে এল ভিক্টররা বিটবাংলোয়। তখন বিকেল ফুরিয়ে আসছে। তিনজনেই ক্লান্ত, শ্রান্ত।

সন্ধেবেলায় বৃষ্টি নামল।

শহর কলকাতায় বৃষ্টি দেখার আগ্রহ ভিক্টরের বড় একটা হত না। কিন্তু এই পাহাড়তলিতে, নির্জনে, অন্ধকারে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ভিক্টর কেমন তন্ময় হয়ে গিয়ছিল। হয়তো কিছু ভাবছিল। কখন যে একসময় তার ঘুম এসে গিয়েছে সে জানে না, যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত হয়েছে, লছুয়া খাবার দিয়েছে টেবিলে।"

খেতে বসে ভিক্টর বলল, "কাল থেকে কি খাওয়া বন্ধ শাসমলসাহেব ?"

লছুয়া সামনেই ছিল। বলল, "কাল হো যাবে।"

নোটন বলল, "তো হো যাক। পরশু কুছ ব্যবস্থা হো যাবে।" বলে হেসে উঠল।

পরের দিন সকালে বেরোতে বেরোতে প্রায় ন'টা বাজল।

সারাদিনের মতন তৈরি হয়ে বেরিয়েছে তারা। দুপুরের খাবার বলতে হাত-রুটি আর আলু-পিঁয়াজের তরকারি, কুমড়ো ভাজা। বড়-বড় দুটো জলের পাত্র কাঁধে ঝোলানো।

রোদ প্রখর নয়। আকাশ মেঘলা। বাদলার ভাব রয়েছে চারদিকে।

ভিক্টরের কেমন মনে হচ্ছিল, আজ মহাদেবদের দর্শন পাওয়া যাবে। মনে হচ্ছিল, কারণ মহাদেবরা বুঝতে পেরেছে শাসমলরা অযথা এখানে আসেননি। সময় নষ্ট করা মানে শাসমলদের সুযোগ করে দেওয়া। মহাদেবরা নিশ্চয় তা দেবে না।

দুপুর পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। একটা টিলার আড়ালে গাছপালার ছায়ায় বসে যখন রুটি আর আলু-পিঁয়াজের অদ্ভুত টনিক খেয়ে তিনজনেই জল খাচ্ছে, হঠাৎ শাসমলেরই যেন নজরে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে শাসমল দূরবিন তুলে নিতে-নিতে বললেন, "ওরা কারা ?"

ভিক্টরও নোটনের দিকে জলের পাত্রটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকাল দূরে।

শাসমল বললেন, "ভিক্টরসাহেব, ওরা এসেছে। মহাদেবরা।"

ভিক্টর হাত বাড়াল। "দূরবিনটা দিন।"

শাসমল দূরবিন দিলেন।

ভিক্টর দূরবিন চোখে দিল। এটা শস্তা দূরবিন নয়। মিলিটারি দূরবিন। সাত-আট বছর আগে ভিক্টর কিনেছিল ডিস্‌পোজাল থেকে। সামান্য গোলমাল ছিল। সারিয়ে নিয়েছে।

ভিক্টর অনেকটা সময় নিয়ে দেখল। তারপর বলল, "শাসমলসাহেব, জায়গাটা তো মনে হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে আমরা কবরখানার ক্রস পেয়েছিলাম। মোটামুটি সেই জায়গা।"

শাসমল বললেন, "এখান থেকে কতটা দূর ?"

"নাক বরাবর হলে আধ মাইল।"

'ওরা কী করছে দেখতে পাচ্ছেন ?"

"গাছের আড়াল পড়ে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে ওরা একটা গাঁইতি চালাচ্ছে। পাহাড়ে চড়া গাঁইতির মতন।"

"আপনি দেখতে পাচ্ছেন ?"

"মোটামুটি পাচ্ছি।"

"এখন কী করবেন ?"

"আমরাও যাব। সাবধানে, আড়ালে আড়ালে।"

"চলুন তা হলে ?"

"আগে নোটন যাবে।" বলে দূরবিন নামাল ভিক্টর। বলল, "নোটন যাবে প্রথমে—নাক বরাবর। সিধে। আপনি যাবেন ওইদিক দিয়ে। ডান হাতি হয়ে। আমি যাব বাঁ দিক দিয়ে।" ভিক্টর হাত নেড়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিল—কে কোন্ দিক দিয়ে যাবে।

শাসমল আর নোটন দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে।

নোটন বলল, "সোজা গেলে দেখতে পাবে যে!" বলে দূরবিনটা একবার চাইল। দেখল খানিকক্ষণ। বলল, "আমি একটু বাঁ দিক ঘেঁসে যাই। গাছপালা রয়েছে। তা ছাড়া ঝোপঝাড়ও পাব।"

ভিক্টর বলল, "তাই যাস। সাবধানে।" বলে শাসমলকে বোঝাতে লাগল, "তিন দিক দিয়ে ঘিরে ফেলা আর কি! অন্য যে পথটা খোলা রইল, সেটা সোজা। যদি ওরা সেই পথে পালায় আমরা দেখতে পাব।"

শাসমল বললেন,"চলুন তা হলে!"

ভিক্টর বলল, "খুব ব্যস্ত হবেন না। ওরা বিকেল পর্যন্ত থাকবে। তার আগে নড়বে বলে মনে হয় না। আমরা ধীরেসুস্থে সাবধানে যাব।"

হাতের ঘড়িটা দেখল ভিক্টর। তিনটে বাজে। দিনটা মেঘলা বলে চট করে সময় ঠাওর করা যায় না। সাড়ে চার কি পাঁচটা পর্যন্ত আলো যা থাকবে তাতে মহাদেবদের নজরে রাখার অসুবিধে হবে না।

ভিক্টররা যেখানে আছে সেখান থেকে মহাদেবদের কাছে যেতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু পাহাড়ি পথ, চড়াই-উতরাই, কোথাও কোথাও ঘুরপথে যেতে হয়, ফলে সময় খানিকটা বেশি লাগারই কথা।

ভিক্টর বলল, "নিন, ধীরেসুস্থে এগোন। সাবধানে যাবেন। যতটা কাছাকাছি পারেন এগিয়ে যাবেন, গিয়ে আড়াল থেকে ওয়াচ করবেন মহাদেবরা কী করছে। ধরা দেবেন না।"

নোটন বলল, "দাদা, আমি বলছিলাম যে আমরা কাছাকাছি হলে যদি শিস দিয়ে জানান দিই হাজির আছি, তা হলে?"

শাসমল বললেন, "ওরা কালা নাকি? শিস শুনতে পাবে না?"

নোটন বলল, "পাখির ডাকের মতন শিস। জঙ্গলে কত পাখি ডাকছে। কেমন করে বুঝবে?"

শাসমল বললেন, "আমি শিস দিতে জানি না।"

নোটন হেসে ফেলল, "ঠিক আছে। টারজানের ডাক ডাকবেন।"

ভিক্টর বলল, "চলুন। আপনাকে শিস দিতে হবে না।"

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়াল তিনজনে। নোটনই এগিয়ে গেল প্রথমে। শিশুগাছের তলা দিয়ে নুড়িপথে নেমে গেল।

শাসমল পা বাড়ালেন। বললেন, "ভিক্টরসাহেব, মহাদেব খুব রাফ। সামলাতে পারবেন?"

"দেখা যাক।"

শাসমলও নিজের রাস্তা ধরলেন।

ভিক্টর মুহূর্তকয় দাঁড়িয়ে থাকল। দূরবিন চোখে লাগিয়ে আবার কিছুক্ষণ দেখে নিল। মহাদেবদের দেখা যাচ্ছে না। গাছগাছালির আড়ালে চলে গিয়েছে।

সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ায় ভিক্টর নিজেই পাকানো সিগারেট তৈরি করে

খাচ্ছিল। বুদ্ধি করে একটা তামাকপাতার প্যাকেট আর কাগজ না আনলে বিপদে পড়তে হত। তামাকপাতা রগড়াতে রগড়াতে একবার আকাশটা দেখল সে। ঘোলাটে মেঘলা। পুবের দিকে খানিকটা মেঘ কালো হয়ে এসেছে।

সিগারেট পাকিয়ে সেটা ধরিয়ে নিল ভিক্টর। পা বাড়াল।

খানিকটা রাস্তা পার হয়ে এসে ভিক্টর এদিক-ওদিক তাকাল। নোটনকে আর দেখা যাচ্ছে না। সে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। শাসমলও অদৃশ্য হয়ে পড়েছেন।

সামনেই সেগুন গাছ। তারপরই বনতুলসীর মতন দেখতে এক ধরনের গাছের ঝোপঝাড়। পাখি উড়ে গেল। হলুদ-লাল বুনো ফুল। তারই সঙ্গে গা মিলিয়ে কলকে ফুলের ঝোপ।

ভিক্টরের মনে হচ্ছিল, আজকের দিনটা বোধহয় বৃথা যাবে না। যাওয়া উচিত নয়। এটা বড় আশ্চর্যের কথা, মহাদেবরা গানাসাহেবের ম্যাপ নিয়ে আজ যেখানে এসে হাজির হয়েছে, মাত্র গত পরশু ঘটনাচক্রে ভিক্টর ওই একই জায়গা থেকে একটা কাঠের ক্রস কুড়িয়ে পেয়েছে। না, কুড়িয়ে পাওয়া বলা যায় না। বলা উচিত কবরখানার মাটি থেকে ভেঙে তুলে নিয়েছে।

ভিক্টরের খেয়াল হল, ক্রসটা চোখে পড়ার পর তো ওই জায়গার ঝোপ খানিকটা পরিষ্কার করেছিল। ছুরিতে কাটা ডালপালা পাতা এখনও ছড়িয়ে আছে জায়গাটায়। মহাদেবরা ওই জায়গাটায় পা দিলেই বুঝতে পারবে, আগে কেউ এখানে এসেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের সন্দেহ হবে। আর সন্দেহটা শাসমল-পার্টির ওপরেই। তারপর.... ?

তারপর কী হয়েছে বা হতে পারে ভিক্টর জানে না। দেখা যাক কী হয়!

খানিকটা সময় নিয়ে ভিক্টর প্রায় জায়গাটার কাছে পৌঁছে গেল। চোখে দূরবিন লাগাল। দেখতে পেল না কাউকে। কোথায় গেল মহাদেবরা ? ওরা কি আরও ভেতরে ঢুকে গিয়েছে!

বাবলাগাছের মতন দেখতে কাঁটার ঝোপের আড়ালে আড়ালে গজ-চল্লিশ-পঞ্চাশ এগিয়ে আসার সময় ঘাড় ঘোরাতেই দূরে শাসমলকে দেখতে পেল ভিক্টর। শাসমলও তা হলে পৌঁছে গেলেন!

আরও সামান্য এগিয়ে ভিক্টর গাছের আড়াল পেল। জামগাছ, বট। হামাগুড়ি দিয়ে গাছের কাছে এসে সামনে তাকাল ভিক্টর। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

মহাদেবরা কেউ নেই। তাদের কিছু জিনিস পড়ে আছে। খুচরোখাচরা জিনিস। যেমন, মাথার টুপি, একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, এঁটো পাতা। খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলে দিয়েছে পাতাগুলো। রবারের ম্যাটও পড়ে আছে এক টুকরো।

মহাদেবরা যে এখান থেকে চলে যায়নি সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওরা আছে কোথায়?

এমন সময় পাখির শিস শুনতে পেল ভিক্টর। হালকা সরু শিস শুনে সত্যিই পাখির ডাক বলে মনে হয়।

ভিক্টর তাকাল।

ঝোপেব পাশে নোটনের মুখ। উবু হয়ে বসে আছে। মাথার ওপর আরও ঘোলাটে হয়ে এল। গাছপালার ছায়ার জন্যে হতে পারে কিংবা মেঘ জমছে আকাশে।

নোটন ইসারায় ব্যাগটা দেখাল।

মাথা নাড়ল ভিক্টর, দেখেছে।

নোটন ইশারা করে বলল, "টেনে নেব?"

ভিক্টর না বলল প্রথমে, তারপর কী মনে করে ইশারা করেই জানাল—টেনে নিতে।

নোটন গিরগিটির মতন বুকে হেঁটে এপাশ-ওপাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। গিয়ে ব্যাগটা উঠিয়ে নিল। নিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ভিক্টর বুঝতে পারছিল না, কী করবে? অপেক্ষা করবে আড়ালে? না, এগিয়ে যাবে?

নোটন ইশারায় জানাল কাছাকাছি কেউ নেই, দেখতে পায়নি সে।

ভিক্টর আড়াল থেকে সাবধানে বেরিয়ে দু-চার পা এগিয়ে গেল।

মহাদেবরা কাছে নেই। তারা বুনো ঝোপঝাড় দিয়ে পায়ে হাঁটার মতন পথ করে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। ভাঙা ডালপালা, ছেঁড়া পাতা চোখে পড়ল ভিক্টরের। তবে বেশিদূর এগোয়নি। বড়জোর গজ-ত্রিশ। তারপর ?

তারপর কী দেখার জন্যে ভিক্টরের ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। খুব সাবধানে পা-পা করে এগিয়ে এসে ভিক্টর দেখল, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দুটো পাথর। পাহাড়ি পাথর। ফিটতিনেক উঁচু। কিন্তু গোল ধরনের। পাথরের মধ্যে খাঁজ যেমন হয়। কিন্তু এই খাঁজের জন্যে পাথরের চেহারাটা একটা আকার পেয়েছে। পাহাড়ি পাথরের যেখানে ছড়াছড়ি সেখানে ঘোড়ার মতন দেখতে, কি হাতির মতন দেখতে, কখনও কখনও রাক্ষসের মতন দেখতে—পাথর দেখতে পাওয়া নতুন কিছু নয়। এরকম হয়। এক-একটা আবার প্রায় চলে আসে নিজের থেকেই।

ভিক্টর দেখল, পাথর দুটো এমন করে পড়ে আছে, যেন ও দুটো কোনও কিছু পাহারা দিচ্ছে।

দুই পাথরের মাঝখান দিয়ে গলে যাবার পর যা চোখে পড়ে সেটা যেন কোনও গুহাগর্ত। মুখটা লতায়-পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে অদৃশ্য ছিল। মহাদেবরা যতটা দরকার সাফসুফ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

ভিক্টর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখল। গুহার কাছে গিয়ে কান পাততেও হল না। শব্দ পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে যেন গাঁইতি মারার শব্দ। পাথরে লাগছে, লেগে আওয়াজ উঠছে। গলার স্বরও পাওয়া যাচ্ছিল। মহাদেবরা কথা বলছে। গুহাটা নিশ্চয় বড় নয়, দীর্ঘও নয়, নয়তো এভাবে স্পষ্ট শব্দ পাওয়া যেত না। মহাদেবরা বেশি দূরে যেতে পারেনি।

আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় এখানে। মহাদেবরা যে-কোনও সময়ে চলে আসতে পারে।

ভিক্টর ফিরে এল।

আগের জায়গায় ফিরে আসতেই শাসমলকে দেখতে পাওয়া গেল। শাসমল একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছটা দেখতে অদ্ভুত। একেবারে সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালগুলো দু' পাশ

থেকে জ্যামিতিক নিয়ম ও নকশা মেনে দু' দিকে ছড়ানো। বড়-বড় গোল পাতা। দেখলে মনে হয়, শতমুখী প্রদীপের নকশা যেন।

ভিক্টর শাসমলের কাছে চলে গেল।

শাসমল মৃদু স্বরে বললেন, "ওদের বাইক নীচে দাঁড় করানো আছে। কোথায় ওরা ?"

ভিক্টর ইশারা করে বলল, "গুহায় ঢুকেছে।"

"গুহা ?"

"সামনে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন। তবে এগিয়ে যাবার দরকার নেই। ওরা এসে পড়তে পারে।"

"গুহার মধ্যে কী খুঁজছে ?"

ভিক্টর হাসল। "চলুন, আমরা অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওরা যাই খুঁজুক, এখান থেকে নিয়ে যাবার সময় দেখা যাবে।"

ভিক্টর ইশারায় নোটনকে সরে আসতে বলছিল। তার আগেই নোটন হাত তুলে কী যেন দেখাল। কাগজের মতন।

সরে আসতে বলল ভিক্টর।

তিনজনে শেষ পর্যন্ত তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। এখান থেকে মহাদেবদের দেখা যাবে।

নোটন বলল, "দাদা, কাগজ !"

ভিক্টর কাগজগুলো নিল। নিয়েই যেন চমকে গেল। বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"শাসমল সাহেব, দেখুন তো। ডায়েরির পাতা কি না ?"

শাসমল দেখলেন। তিনিও অবাক। বললেন, "হ্যাঁ, ছেঁড়া পাতাগুলো।"

ভিক্টর যেন ক' পলকে পাঁচ-ছ'টা পাতা উলটে গেল। "এই সেই ম্যাপ।"

শাসমল দেখলেন। মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ, ম্যাপ।"

ভিক্টর বলল, "এবার আমরা ফিরে যেতেও পারি।"

"ফিরে যাব ?"

"খানিকক্ষণ দাঁড়াতেও পারেন। মহাদেবদের দেখার জন্যে।"

"মানে ?"

"মানে, যদি দেখতে চান মহাদেবরা গুহা থেকে কোনও নীল বামন ধরে আনছে, তা হলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। তবে আমার মনে হয় না, ওরা কোনও বামন ধরে আনতে পারবে ?"

"তা হলে ?"

"আমার মনে হয়, ওরা নিজেরাই আমাদের কাছে যাবে।"

"আমাদের কাছে ?"

ভিক্টর ডায়েরির পাতাগুলো দেখাল। হেসে বলল, "এগুলোর জন্যে। ওরা গুহা-অভিযান করার সময় ব্যাগের মধ্যে কাগজগুলো রেখে গিয়েছিল। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, চোরের ওপর বাটপাড়ি করার মতন বাটপাড় এখানে আসতে পারে। বেচারিরা বড় ভুল করেছিল। এখন এই কাগজগুলোর জন্যে বিটবাংলোয় না ছুটে উপায় কী !"

শাসমল বললেন, "যদি আসল জিনিস পেয়ে যায়, কাগজগুলোর কী দাম ?"

"আসল জিনিসটা কী ?"

"জানি না।"

"তা হলে শুনুন। যে জিনিসই ওরা পাক আজ আর নিয়ে যাবার সাহস করবে না। ব্যাগ চুরি থেকেই বুঝতে পারবে ওদের ওপর চোখ রাখার জন্যে শাসমল অ্যান্ড কোম্পানি দাঁড়িয়ে আছে। হয় ওরা আসল জিনিস কোথাও লুকিয়ে রেখে যাবে, না-হয় আপাতত অন্য কোনও মতলব ভাববে।"

শাসমল কিছু বললেন না।

ভিক্টর বলল, "আরও একটা কথা আছে শাসমলসাহেব। আমার তো মনে হচ্ছে, আপনারা আগাগোড়া ভুল করেছেন। ডায়েরির মধ্যে কতকগুলো কোড্ ওয়ার্ড আছে। সাঙ্কেতিক শব্দ। এগুলোর মানে না বুঝে মাথা খারাপ করার কোনও অর্থ নেই। চলুন, মানেটা আগে বোঝবার চেষ্টা করি।"

শাসমল বোকার মতন তাকিয়ে থাকলেন।

সোনার পেটি

সন্ধের মুখে আবার বৃষ্টি নামল। কালও নেমেছিল।

ভিক্টর কোনওরকমে স্নান সেরে ডায়েরির ছেঁড়া পাতাগুলো নিয়ে বসে পড়েছিল। লণ্ঠনের আলোয় আলো কম, কালি বেশি। চোখ টনটন করছিল। ঘণ্টা-দেড়েক কেটে গেল। শাসমল বারান্দায় বসে-বসে বৃষ্টি দেখছেন। নোটন গিয়েছে লছুয়ার সঙ্গে তামাশা করতে।

হঠাৎ ভিক্টর চেঁচিয়ে উঠল, "শাসমলসাহেব, শিগগির !"

শাসমল বললেন, "হল কী ?"

"আসুন। রহস্য উদ্ধার হয়েছে।"

শাসমল ঘরে এলেন।

ভিক্টর বলল, "কাগজ-কলম নিন। এই যে সামনে পড়ে আছে।"

শাসমল কাগজ-কলম উঠিয়ে নিলেন।

ভিক্টর বলল, "ভাষাটা টেলিগ্রামের মতন। যেটুকু না দিলে নয়। আর শব্দগুলো কোড করে বসানো। নিন, আমি বলছি। আচ্ছা তার আগে এই দেখুন এখানে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে। বিস্ময়-চিহ্ন। মানে কোড্‌টা লম্বালম্বি সাজানো আছে। পাশাপাশি নয়। প্রথম শব্দটা কী দেখছেন ? অ্যাবাভ—ABOVE। অ্যাবাভের A নিন। লিখুন। তারপর নীচে দেখুন। শব্দটা হল দেম্—THEM। দেম থেকে M নিন। লাস্ট ওয়ার্ড। লক্ষ করে দেখুন, কোনও শব্দই চার পাঁচের বেশি অক্ষর দিয়ে নয়। একমাত্র শেষ শব্দটা ছ'অক্ষরের। যাকগে, আপনি পেলেন A আর M। প্রথম দুটো শব্দের হিসেব হবে ফার্স্ট ওয়ার্ড আর লাস্ট ওয়ার্ড নিয়ে। পরের দুটো শব্দের হিসেব ধরতে হবে দু'নম্বর ওয়ার্ড আর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে। দেখুন এখানে আছে FINE, ফাইন-এর দু'নম্বর ওয়ার্ড নিন ; আর পরের শব্দের লাস্ট ওয়ার্ড 'L' -এল। শব্দটা ছিল DRILL। তা হলে কোডের হিসেব দাঁড়াচ্ছে, ওয়ান অ্যাণ্ড ফোর, টু অ্যাণ্ড ফাইভ। তারপরই সেটা পালটে গিয়ে দাঁড়াবে ফোর ওয়ান, ফোর টু। আবার সেই ওয়ান ফোর, টু ফাইভ।"

শাসমল বললেন, "অঙ্ক জেনে আমার দরকার নেই। মানেটা বলুন ?"

ভিক্টর বলল, "মানেটা ধরতে পারবেন। আগে লিখে যান।"

ভিক্টর কোড্ উদ্ধার করে বলতে লাগল আর শাসমল লিখতে লাগলেন। A MILITARY PLANE.....CARRYING TWO....TWO BOXES OF GOLD....

কোড্-এর ধাঁধাটার অর্থ উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল এই : যুদ্ধের সময় একটা মিলিটারি প্লেন দু'পেটি সোনা নিয়ে সিঙ্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। যেতে গিয়ে আগুন লেগে এখানে ভেঙে পড়ে। সোনার পেটি আর উদ্ধার করা যায়নি। এখনও এই সোনা কোথাও না কোথাও পড়ে আছে।

শাসমল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই নোটন ফিরে এল।

শাসমল বললেন, "সোনাব পেটি ?"

"মিলিটারি পেটি মশাই।"

"প্লেন ভেঙে পড়ে গিয়েই ক্যাম্পে আগুন লেগেছিল তা হলে ?"

"তা ছাড়া আর কী !"

"সিঙ্গাপুরে সোনা যাবে কেন ?"

"তা বলতে পারব না। তবে সিঙ্গাপুব নিশ্চয় তখন ব্রিটিশদের হাতছাড়া হয়নি। পরে জাপানিরা...."

"গানাসাহেব এসব জানলেন কোথা থেকে ?"

"সাহেবই বলতে পারতেন। শুনেছিলেন কোথাও থেকে।" কিংবা সাহেব সিক্রেট সার্ভিস করতেন।"

"আর ওই বামন ? মানে ডোয়ার্ফ ?"

ভিক্টর বলল, "ওটা ডোয়ার্ফ নয়। আপনারা আগাগোড়া ভুল করেছেন। আমাব মনে হয়, যে দুটো পাথর বসানো আছে গুহার সামনে সেই দুটোকে উনি বুঝিয়েছেন। ওঁর ধারণা হয়েছিল, কিংবা কিংবদন্তিও হতে পারে, ওই পাথর দুটো যক্ষের ধন পাহারা দেবাব মতন করে যেন বসে আছে।"

শাসমল বললেন, "উনি লিখেছিলেন নীল রং। পাথরের রং নীল হয় ?"

"না। কালো হয়। কিন্তু ডায়েরিতে তো নীল লেখা নেই। লেখা আছে

নীলচে। অনেক সময় বৃষ্টি-বাদলার পর, গাছপালার মধ্যে দিয়ে আসা রোদের জন্যে রঙের ভুলচুক হয়। তা ছাড়া গানাসাহেব বংকানা হতে পারেন। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।"

"কী নিয়ে তবে মাথা ঘামাব ?"

"সোনার পেটি।"

শাসমল বললেন, "মহাদেবরা কি গুহার মধ্যে সেটা পেয়েছে ?"

"সম্ভাবনা কম," বলে ভিক্টর একটা সিগারেট পাকাতে লাগল। সিগারেট পাকানো হয়ে গেলে ধরিয়ে নিল. ধোঁয়া টানল, বলল তারপর, "প্লেন ভেঙে আগুন লেগে তখন যা অবস্থা কেউ আর পেটির দিকে নজর দেয়নি। জানবেই-বা কেমন করে পেটিতে কী আছে। ওটা তো কনফিডেনসিয়াল। সেটা কোথায় কী অবস্থায় ছিটকে পড়েছে কেউ জানে না। মাটি পাথর গাছপালায় ওই দুটো পেটি এখন কোন পাতালে তলিয়ে আছে বলা অসম্ভব। আমার মনে হয়, অনেক বছর পরে কার্লোর যে দলটি এসেছিল—তারা সোনার সন্ধানেই এসেছিল। হয়তো তাদের কাছে ডিটেকটার ধরনের কোনও যন্ত্র ছিল। শুনেছি আজকাল এসব যন্ত্র খুব কাজের। তা কার্লো তো মারাই গেল।"

নোটন বলল, "রাত হচ্ছে, দাদা।"

"হ্যাঁ। কাগজপত্র তুলে ফ্যাল। এই পাতাগুলো আমার আর তেমন দরকার নেই। ওদের আছে—মহাদেবদের। সাবধানে রাখিস।"

নোটন কাগজপত্র পরিষ্কার করতে লাগল।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে শুতে-শুতে প্রায় দশটা বাজল। এখন আর বৃষ্টি নেই। হাজার হাজার ঝিঁঝি ডেকে চলেছে।

ভিক্টর ঘুমিয়ে পড়ল।

শাসমল জেগে থাকলেন কিছুক্ষণ।

নোটন বাইরে দরজার কাছে খাটিয়া পেতে শুয়েছিল। দরজাটা ভেজানো।

কখন যেন আকাশে আচমকা একটু চাঁদও উঠেছিল—সেই চাঁদের আলোয় ছায়ার মতন যে দুটি মূর্তি বিটবাংলোয় এসে দাঁড়াল— তাদের কেউ দেখল না।

নোটন অঘোর ঘুমে।

আচমকা তার দমবন্ধ হয়ে আসায় ঘুম ভেঙে উঠে বসতে যাচ্ছিল। উঠতে পারল না। হাত-পা ছুঁড়ল।

কে যেন তার গলা টিপে ধরে আছে।

চাপা গলায় রুক্ষভাবে কে যেন বলল, "চুপ। কথা বলার চেষ্টা করলে গলার নলি উড়িয়ে দেব।"

নোটন অনুভব করল একটা ধারালো ছোরার আগা তার গলার চামড়া ছুঁয়ে রয়েছে। শব্দ করার সাহস হল না নোটনের।

"দাঁড়াও।" লোকটা উঠে দাঁড়াতে বলল নোটনকে। নোটন উঠে দাঁড়াল।

দুটো লোক। একজনের হাতে ছোরা, অন্যজনের হাতে পিস্তল।

দরজার সামনে থেকে খাটটা সরিয়ে দিয়ে পিস্তলওলা লোকটা দরজা ঠেলল। ভেজানো দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরের পাতলা চাঁদের আলো ঘরের জানলা বরাবরও পৌঁছতে পারেনি।

নোটনের গলায় ছোরা ছোঁয়ানো। নোটনকে নিয়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল একজন। অন্যজন পিস্তল হাতে দু'পা এগিয়ে।

"টর্চটা জ্বালো।"

নোটনের গলার কাছে যে ছোরা ধরে দাঁড়িয়েছিল সে টর্চ জ্বালতে বলল। বাঁ হাতে টর্চ ছিল পিস্তলওলার। টর্চ জ্বালল। জ্বেলে ঘরের মধ্যেটা দেখল। ভিক্টর পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। শাসমল চিত হয়ে শুয়ে। নাক ডাকছেন। বেশি-বেশি নাক ডাকছেন যেন।

পিস্তলওলা ঘরের প্রতিটি জিনিসের ওপর আলো ফেলে দেখছিল। হয়তো ব্যাগটা খুঁজছিল।

ভিক্টর পাশ ফিরে শুয়ে। ঘুমের ঘোরে নড়াচড়াও করছে না।

পিস্তলওলা ব্যাগটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যে কী হল—নোটনও বুঝতে পারল না, শুধু একটা শব্দ শুনল, আর দেখল পিস্তলওলার পিস্তল মাটিতে পড়ে গিয়েছে, একটা ছোরা ছিটকে এসে দরজার পাল্লায় লেগে মাটিতে পড়ে গেল।

শাসমল যেন স্প্রিং-দেওয়া যন্ত্র। ওই চেহারায় কখন যে ভল্ট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বোঝাই যায় না। হাতে আরও একটা ছোরা। সার্কাসের ড্যাগার ম্যান।

ভিক্টর উঠে পড়ল। যেন শব্দ শুনেই উঠছে। আসলে তার ঘুম আগেই ভেঙেছিল। সুযোগ খুঁজছিল উঠে পড়ার।

পিস্তলওলার হাতের পিস্তল মাটিতে, টর্চটাও পড়ে গিয়েছে।

ভিক্টর নিজের টর্চ হাতে উঠে পড়ল। "বাতিটা জ্বালতে হয় শাসমলসাহেব!"

"জ্বেলে নিন। আমি টার্গেট করে আছি।" বলে পিস্তলওলাকে দেখাল। একটু নড়লেই শাসমলের ছোরা গিয়ে তার গলায় বা বুকে বিঁধবে।

ভিক্টর লণ্ঠন জ্বালল।

মেটে আলোয় সকলেই সকলকে দেখছিল।

"মহাদেববাবু না?" ভিক্টর বলল, "নোটনের গলার কাছ থেকে ছোরাটা নামিয়ে নিন। না নিলে..." বলে পিস্তলওলাকে দেখাল। অর্থাৎ আপনার বন্ধুটিও রক্ষা পাবে না। এই না চৌধুরী? হাসপাতালের। শরৎবাবুর বর্ণনা যেন মিলে যাচ্ছে।

মহাদেব শাসমলের দিকে তাকাল। সে ভাল করেই জানে সার্কাসের এককালের ড্যাগার থ্রোয়ার ওই লোকটা বিপজ্জনক।

ভিক্টর বলল, "মহাদেববাবু, খুনোখুনি করে লাভ নেই। লড়াইটা আপসে মিলিয়ে ফেলা ভাল।"

মহাদেব একটু ভাবল, তারপর নোটনকে ছেড়ে দিল।

ভিক্টর বলল, "শাসমলসাহেব, পিস্তলটা পায়ে করে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিন। ওটা আমরা কেউই ছোঁব না। এখন আমাদের পিস্ কনফারেন্স হবে।"

শাসমল এগিয়ে গিয়ে পায়ে করে পিস্তলটা ঠেলে দিলেন খাটের তলায়।

ভিক্টর বলল, "মহাদেববাবু, আপনারা বসতে পারেন।"

মহাদেব বলল, "ডায়েরির কাগজগুলো আপনারা হাতিয়ে এনেছেন?"

"এনেছি। ব্যাগ সমেত।"

"ওগুলো ফেরত পাব ?"

"না।"

"সুনন্দনকে ফেরত দেবেন ?"

"হ্যাঁ। আমার সঙ্গে চুক্তি ছিল - ডায়েরিটা খুঁজে দেওয়া। তা ডায়েরিটা আপনারা ফেরত দিয়েছেন। ছেঁড়া পাতাগুলো আমি ফেরত দেব। দিতে পারলে দুটো পয়সা পাব—এই আর কি !"

মহাদেব ভিক্টরকে দেখল। তারপর বলল, "বেশ তাই দেবেন। দিয়ে বলবেন, ধুরন্ধর আর ধূর্ত আমি অনেক দেখেছি, নন্দন—মানে সুনন্দনের মতন আর কাউকে দেখিনি। একদিন ওকে পস্তাতে হবে।"

শাসমল বললেন, "সুনন্দন ধূর্ত ! না, তুমি তার বন্ধু হয়ে..."

মহাদেব হাত তুলে বাধা দিল। বলল, "যা জানেন না—তা নিয়ে কথা বলবেন না। নন্দন আপনার মনিব হতে পারে কিন্তু সেরা শয়তান। যাক্....ওসব কথা তুলে লাভ নেই। আমরা বোধহয় যেতে পারি ?"

ভিক্টর বলল, "আরে, আপনি চটে যাচ্ছেন কেন ? কে শয়তান, কে শয়তান নয়, সেকথা যেতে দিন। কী ঘটেছে যদি বলেন ব্যাপারটা বুঝতে পারি। আমি জানি সোনাব পেটি আপনারা পাননি।"

"না।"

"কী পেয়েছেন ?"

"কিছু হাড়গোড় কঙ্কাল।"

"গুহার মধ্যে ?"

"হ্যাঁ।"

"মহাদেববাবু, একটা কথা আমায় বলুন। সোনার কথা আপনি জানলেন কেমন করে ?"

মহাদেব বলব কি বলব না করে বলল, "নন্দন একটা ইডিয়েট, বোকা, বুদ্ধু। সে একবর্ণও বোঝেনি সাহেবের ডায়েরির ওই জায়গাটা। আমি দিনের পর দিন মাথা ঘামিয়ে কোড্-এর মানে বার করেছিলাম। কথা ছিল—সোনার পেটি আমরা দু'জনে সমান অংশে ভাগ করে নেব। নন্দন প্রথমে রাজি হয়েছিল, পরে যখন দেখল, ভাগ দেওয়াটা বোকামি হবে

তখন সে আমার পেছনে লোক লাগাল। আমাকে হয় খুন করবে না-হয় মাস ছ'য়েকের জন্যে বিছানায় ফেলে রাখবে। এরমধ্যে নিজে কাজ হাসিল করে নেবে।"

"আচ্ছা!...তখন আপনি ডায়েরি চুরি করলেন?"

"করলাম। মুখে সামনাসামনি আমরা বন্ধু হয়ে থাকলাম, ভেতরে ভেতরে যে-যার মতন প্যাঁচ কষতে লাগলাম।"

"চুরি করা ডায়েরি আপনি ফেরত দিতে গেলেন কেন? অবশ্য কাজের পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে।"

মহাদেব সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "না দিলেও চলত। দিলাম নিজের বাহাদুরি দেখাতে। নন্দনকে বুঝিয়ে দিলাম, ও আমার সঙ্গে টেক্কা মারতে এসে ভুল করেছে। আমি ওরকম পাঁচটা নন্দনকে পকেটে পুরতে পারি।"

শাসমল হঠাৎ বললেন, "হাসপাতালের শরৎবাবু তোমার কেউ হয়?"

"আমার কেউ হয় না। ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি টাকা ধার করি। লোকটা সুদখোর। মানি লেন্ডার। দোকানের জন্যে অনেক টাকা নিয়েছি।"

ভিক্টর এবার চৌধুরীর দিকে তাকাল। "এটি কে? হাসপাতালের চৌধুরী?"

"হাসপাতালে ও কয়েক দিন ছিল। ও আমার লোক। ওর নাম চৌধুরী নয়, মিশ্র। ও একজন কোড্ এক্সপার্ট।"

"আচ্ছা!...পিস্তল চালাতেও পারে?"

মহাদেব এবার কেমন যেন হাসল। বলল, "পারে। শুটিংয়ে প্রাইজ পেয়েছে। তবে খুনি নয়।" বলে কী মনে করে শাসমলের দিকে তাকাল, "শাসমলদা, খেলাটা ভালই দেখালেন। তা সত্যি বলতে কি পিস্তল চালাবার জন্যে আমরা আসিনি। এসেছিলাম ছেঁড়াপাতাগুলো উদ্ধার করতে। পিস্তলটা আপনারা দেখতে পারেন। ওটা নকল পিস্তল। যাত্রাদলের। ভয় পাওয়ানোর জন্যে সঙ্গে রেখেছিলাম।"

ভিক্টর বলল, "ছেঁড়াপাতাগুলো নিয়ে কী করতেন আপনি?"

"আবার দেখতাম। যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে! শোধরাবার চেষ্টা

করতাম। মাটি খুঁড়তে বসতাম আবার।"

মাথা নাড়ল ভিক্টর। বলল, "বৃথা চেষ্টা করতেন। আপনি যে ভুল করেছেন, আমিও সেই একই ভুল করেছি। ভেবেছি ওটা গোল্ড। সোনার পেটি। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে অনেক ভেবেছি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার মনে হল, গোল্ড কথাটাও কোড্। ডবল কোড্। ওটাও তো কোড্। গোল্ড মানে এখানে সোনা নয়, গ্রেনেড্। এক ধরনের স্পেশ্যাল গ্রেনেডের তখন কোড নাম ছিল 'গোল্ড'।"

মহাদেব কেমন বোকার মতন তাকিয়ে থাকল।

ভিক্টর বলল, "আচ্ছা মহাদেববাবু, সত্যি করে বলুন, সোনার নেশায় কি সুনন্দনবাবুর অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে আপনার কোনও... ?"

মাথা নাড়ল মহাদেব, "না।"

"আর প্যান্থার সার্কাসের চিঠির ব্যাপারটা ?"

"ওরা সার্কাসপার্টি নয়, স্মাগলার পার্টি। ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড স্মাগলার।"

"ওরা কেমন করে জানল, সুনন্দনের কাছে সোনার খবর পাওয়া যাবে ?"

মহাদেব বলল, "এসব কথা সুনন্দনকে জিজ্ঞেস করবেন। সে আপনার চেয়েও খবর বেশি রাখে।"

"আর নীল বামন ?"

"বাদ দিন। ও একরকম সোনার হরিণ।...আপনারা কি আমাদের সকাল পর্যন্ত আটকে রাখবেন ?"

"সকাল তো হয়েই এল। খানিকক্ষণ বসে যান।"

ভোর ফুটতেই মহাদেবরা চলে গেল।

শাসমল বললেন, "ওরা তো ফিরে গেল ! আমরা ?"

"আমরাও ফিরব।...তবে শাসমলসাহেব, আপনাকে একটা পরামর্শ দিই। সুনন্দনকে আপনি এবার ত্যাগ করুন। সুবিধের মানুষ নয় আপনার মনিব। সোনা খোঁজার নেশা ওর যাবে না।"

"আপনি যে বললেন সোনা নেই। গোল্ড মানে এখানে গ্রেনেড্।"

"মিথ্যে কথা বললাম। মহাদেবদের বাঁচালাম অনর্থক কষ্ট থেকে। সোনা হয়তো আছে কোথাও। তা যদি কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যায়, সেটা হবে সরকারের সম্পত্তি। আইন সেকথাই বলে।"

নোটন বাইরে চ'লে গিয়েছিল। বলল, "দাদা, চায়ের ব্যবস্থা দেখি।"

ভিক্টর আর শাসমল বাইরে এল। সবে সকাল হয়ে আসছে। আকাশ এখনও রাঙা হয়ে ওঠেনি।